

# স্যাটারডে ক্লাব

## ভূমিকা

পৃথিবীর বহু দেশে বিভিন্ন মাধ্যমের রাশ টানবার জন্য আইনে হয়তো অনেক বোধগম্যহীন ধারা আছে কিন্তু আরেকজনের ভাবনা সম্পর্কিত আলোচনার রাশ টানবার মত আইনের কোন ধারা কোন দেশে আছে কিনা সেটা আমার জানা নেই। একটি জাতি বা গোষ্ঠী যদি তার ভাবনার অর্গল সব বন্ধ করে একটি নির্দিষ্ট গন্ডির মাঝে নিজেকে আঁটকে রাখে তখন সেই জাতির কাছে অন্ধকার ছাড়া আর কি আশা করা যায়।

লাগামহীন ভাবনার সাগরে ডুবে যাওয়া মানুষের অভাব কোন কালেই ছিলনা। এধরনেরই কিছু মানুষ একত্রিত হয়ে তৈরী হয়েছে আমাদের ভাবনার ক্লাব। ভাবনা সম্পর্কিত ভাবনার কোন অন্ত নেই এই ক্লাবের সদস্যদের। প্রতি সপ্তাহে শনিবার সকাল এগারোটোর মধ্যে এই ক্লাবের আসর বসে, সেই কারনেই ক্লাবের নাম দিয়েছি আমরা "স্যাটারডে ক্লাব"। ক্লাবের সদস্য সংখ্যা মাত্র জনা আষ্টেক, তাও সকলে নিয়মিত সদস্য নন, অর্থাৎ, সব শনিবারে সবাই উপস্থিত হয় ঠিক তা নয়। যার ইচ্ছে আসেন, তবে চার/ পাঁচজন থাকেনই। আমিও যোগ দেই মাঝে মাঝেই, ঢাকায় থাকলে যাই।

স্যাটারডে ক্লাবের সদস্যগন সবাই সেক্যুলার গনতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন কিন্তু নিজ নিজ ধর্মে বিশ্বাসী। আমাদের এইসব আলোচনা যাতে কোন সময় ধর্মের নিষিদ্ধ সূক্ষ সূতাগুলো অতিক্রম না করে, সেটি ভাবনায় রাখা ছাড়াও সকল আলাপে আমাদের ভাবনার ব্যক্তিগত অংশটুকু বাদ দেবার চেষ্টা করি। কারন, পৃথিবীর প্রায় সব সমস্যার মূলে রয়েছে ব্যক্তিস্বার্থ বা গোষ্ঠীস্বার্থ।

এই ক্লাবের সমস্যা একটা আছে। যিনি এই আড্ডার হোস্ট, তিনি পেশায় মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। তার অফিসেরই একটা কক্ষ আমাদের ভাবনা ক্লাবের জন্য বরাদ্দ করেছেন। তিনি কিছুটা কৃপণ হওয়ার কারনেই হোক আর এই ফালতু প্যাঁচালের আড্ডাটি বেশীক্ষন চলা তার পছন্দ না হওয়ার কারনেই হোক, শুধু চা-কফি ছাড়া দুপুরের খাবারের কথা কখনোই বলেন না। যদিও আপ্যায়নের এই ক্রটিটুকু আমরা গ্রাহ্য না করে, খাওয়া-দাওয়া ছাড়াই আমাদের এই আড্ডা চালিয়ে যাই, পাঁচ/ছয় ঘন্টা কোন ব্যাপার না।

ক্লাবের সদস্যদের মাঝে একজন আছেন ক্যামেরাম্যান, অর্থাৎ, ছবি তোলা যার নেশা, পেশা, শখ বা শেষ কথা যদি বলতেই হয়, জীবন। তিনি জীবনের সব কিছুই দেখেন তার ক্যামেরার চোখে।

আরেক জন আছেন যিনি সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী, এই পর্যন্ত যত ভাবনা নিয়েই আমরা কথা বলেছি, সেই ভাবনার সমাধানের বেশীরভাগ তারই মুখ নিঃসৃত বাণী, তাকে আমরা সঞ্চালক বলে ডাকি।

ডাক্তার, ইনি পেশায় ডাক্তার হলেও তন্ত্র শব্দটি তার খুব প্রিয় একটি শব্দ। কোথায়ও যদি তন্ত্র শব্দটি দেখেন বা শোনেন, ব্যাস আর কোন কথা নেই, ঝাপিয়ে পরে গোগ্রাসে গিলে ফেলবেন।

রাজনীতিবিদ, উনি ঢাকা শহরের বড় একটি রাজনৈতিক দলের কোন এক থানা কমিটির প্রথম সারির নেতা। খুব গোড়া সমর্থক না হলেও তার রাজনৈতিক দলের পক্ষেই তিনি সবসময় তর্ক করেন। কিন্তু যেহেতু ভাবনা ক্লাব সরাসরি কোন রাজনৈতিক আলাপ পছন্দ করে না, তাই তিনি কখনই ভাবনা ক্লাবের ভাবনা গুলোতে জমিয়ে ঠাই করে নিতে পারেন না।

জমিদার নন্দন, এই মানুষটি ছোট খাটো নাদুশ নুদুশ গড়নের এক সুখী মানুষ। কোন পেশায় নেই। বাবা ঢাকা শহরে রেখে গিয়েছেন অটেল সম্পত্তি আর তার সাথে উপড়ি হিসেবে পেয়েছেন সরকারি চাকুরীজীবী দারুন এক স্ত্রী, যিনি স্বামীর এই জমিদারি সুখে কখনই বাধা দেন না। এই হাসি খুশী মানুষটি শুধু আড্ডাই পছন্দ করেন, ভাবনার গভীরে যাওয়াটা তার ধাতে নেই।

আরও আছেন, সাংবাদিক, ফৌজি। তাদের পরিচয় আপাতত অপ্রয়োজনীয়। সময়ে দেয়া যাবে।

এই জগতের সকল ভাবকের ভাবনাই প্রতিমুহুর্তে তার দিক পরিবর্তন করে। আর এই ক্লাবের সদস্যরা তো ভাবুকই, তাই ভাবনা ক্লাবের ভাবনা গুলোও ক্ষণে ক্ষণে তার দিক পরিবর্তন করে, রঙ পরিবর্তন করে।

মানুষ চিন্তা করে কেন?? মাথা আছে বলেই?? সেটা তো একটা সাধারণ ধারণা মাত্র। ব্রেইনের নিউরো রিয়াকশন বাধ্য করে মানুষকে চিন্তা করার জন্য। সফ্রেটিস, প্ল্যাটো থেকে শুরু করে গ্রামসী, রুশো কিংবা বর্তমান যুগের হানটিংটন সহ যারা সমাজ, রাজনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা করেছেন বা করে চলেছেন, তাদের এতো কি প্রয়োজন ছিল নিজ স্বার্থের কথা না ভেবে, সকল ইহজগতীয় সুখচিন্তা বাদ দিয়ে, ঘর সংসারের ভাবনাকে চিলেকোঠায় তুলে রেখে, মানুষ এবং মানব সমাজের জন্য শুধু ভেবে ভেবেই দর্শন শাস্ত্র নামে আরেকটা শাস্ত্রই তৈরি করে মাথাটাকে কষ্ট দেবার। তারা কি পাগল ছিলেন? ভাবনা-ক্লাবে বসে বসে সমাজ, গনতন্ত্র, রাজনীতি, রাষ্ট্র ইত্যাদি উদ্ধার করে চলা সব ভাবুক গুলো বোধহয় নিজেদের কে সেই পাগল বংশের ধামাধরা, মানে, তাদের অনুকরণকারি মনে করে।

ভাবনা সম্পর্কিত ক্যামেরাম্যানের তস্ব হল, সব মানুষের মাঝেই কমপক্ষে আট রকমের অপ্রীতিকর ভাবনা কাজ করে,

(১) বিষন্নতা (২) অপমান বা অমর্যাদা (৩) নিরুপায় অবস্থা (৪) হতবুদ্ধিতা (৫) ক্রোধ (৬) অরক্ষিত অবস্থান (৭) মনোভঙ্গ (৮) নৈরাশ্যবোধ।

তারমানে এই নয় যে, তিনি মনে করেন শুধু এই আটটি অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রন করতে পারলেই মানুষের ভাবনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করা যাবে।

ওনার বক্তব্য হল, ওই অপ্রীতিকর আটটি মৌলিক অনুভূতি ছাড়াও আরো বহু ফ্যাক্টর আছে। কোন অনুভূতি মানুষকে উদ্দীপিত করে, কোন অনুভূতি ভয়ের জন্ম দেয় ইত্যাদি আরো কত কি। ভাবনাকে শুধু এই আটটা ছোট্ট পরিধির মাঝে বাঁধার চেষ্টা করার কোন মানে হয়না। মানুষের ভাবনার মূল উৎস ব্রেইন, আর সেটার কর্ম পরিধি এত বিশাল যে আমাদের মত মানুষ সেই জ্ঞানের ধারে কাছেও যেতে পারবে না। ব্রেইনের বাম দিক যুক্তির, ডান দিক মানবিক অনুভূতির, সামনের অংশ সমস্যা সমাধান থেকে শুরু করে আরো অনেক কাজ করে। পেছনের অংশ নাকি আরো ভেজাইল্লা। একটি গবেষণায় নাকি পাওয়া গিয়েছে, মানুষ গড়ে প্রতি দশ সেকেন্ডে একবার হলেও যৌনতা নিয়ে চিন্তা করে। এতগুলো বিষয়ের ব্রেইনকে যারা একটা নূন্যতম সূতায় গাঁথতে পারে তারাই সফল ভাবে তাদের ভাবনাকে সঠিক পথে চালাতে পারে।

ভাবনা ক্লাবের তাস্বিক এবং প্যাঁচালিক ভাবনা সম্পর্কিত তস্ব নিয়ে যে যার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের আলোকে এভাবেই আলোকিত করেন ক্লাবের শনিবারের আলোচনা।

## **ভাবনা ক্লাবে আলোচন**

এহেনো অদ্বুত চিন্তা সম্পন্ন ভাবনা ক্লাবে জানুয়ারির মাসের প্রথম দিকের কোন এক শনিবারে যেয়ে দেখি অস্থির ব্যাপার স্যাপার। সবাই খুব উত্তেজিত। কেউ বলছে এটা হতে পারে না, কেউ বলছে আপনারা আমাদের সাথে সংলাপের মাধ্যমে কাজটি করতে পারতেন, কেউ বলছে আমরা যদি আলোচনের ডাক দেই আপনারা উড়ে

যাবেন, আপনাদের অস্তিত্ব থাকবেনা। বিষয় কি, কাকে উদ্দেশ্য করে এতো ঝড়ো হাওয়া বইছে কিছুই বুঝতে পারছিলাম।

শেষ পর্যন্ত এসব হৈচৈ এর মাঝে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম, বললাম,

-আমি আজ একটি প্রসঙ্গে আলাপ করতে চাই।

ওষুধে কাজ দিল। ডাক্তার সাহেব প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠলেন,

-রাখেন আপনার প্রসঙ্গ; ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আগামী মঙ্গলবার যেয়ে বৃহস্পতিবার ফেরার ঢাকা-সিলেট-ঢাকার সাতটি এয়ার টিকেট ফ্রি পেয়েছেন, যেটা তিনি ভাবনা ক্লাবের এক দশক পূর্তি উপলক্ষে ক্লাবকে গিফট করতে চান; মৌলভীবাজার যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন ইঞ্জিনিয়ার, সঞ্চালক আর ক্যামেরাম্যান মিলে; সঞ্চালক সাহেবের আল্লীয় ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন চা বাগানের বিশাল বাঙালো, ক্যামেরাম্যান মাইক্রোবাসের ব্যবস্থা করছেন।

আমি বললাম,

-থারাপ কি, এই কারণে এতো ধ্বংসাত্মক আলাপ কেন।

লাফ দিয়ে উঠে জমিদার নন্দন বললেন,

-আরে অফিস খোলা, সবার কাজ আছে না, যাবে কি করে সবাই।

আমি বললাম,

-আপনার জমিদারী আছে, আপনার আবার অফিস খোলা বন্ধের সাথে সখ্যতা কিসের।

জমিদার নন্দন উত্তর দিলেন,

-আরে ঘুমটা তো অফিস খোলা থাকলেই দিতে পারি; অফিস বন্ধ থাকলে বউ একবার মাছ কিনতে পাঠাবে, আরেকবার ধইন্যাপাতা কিনতে পাঠাবে, আরেকবার কাঁচামরিচ; ঘুম বাদ দিয়ে আমি কি ভাবে যাই।

সমস্যাটিকে গুরুত্ব দিতেই হয়, আমি সঞ্চালককে বললাম,

-উইকেন্ডে যাওয়া যায়না।

তিনি বললেন,

-যাওয়া গেলে কি এতো আন্দোলনের সুযোগ দেই; টিকেটের অফারটা তো এসেইছে এভাবে।

আমি বললাম,

-তাহলে তো আপনারা তিনজনই যাবেন।

সঞ্চালক বললেন,

-আরে, আপনার কথা ভেবেই তো যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি; আপনার সিলেটে না সামনে স্থানীয় সরকার নির্বাচন।

আমি বললাম,

-সেটা ঠিক, আমি ঐ মঙ্গলবার থেকেই সিলেটে আছি কিন্তু আপনারা তো শ্রীমঙ্গলে যাচ্ছেন; ওখান থেকে ইলেকশন ওয়ার্ক করতে যাওয়া আসা করলে দুই ঘন্টা দুই ঘন্টা মোট চার ঘন্টা লেগে যাবে রাস্তাতেই।

ইঞ্জিনিয়ার গোমড়া মুখে বসে ছিলেন এতক্ষণ। গোমড়া মুখেই বললেন,

-কি জ্বালা, আপনার জন্যই তো যাওয়ার প্ল্যান করলাম, এখন আপনেও ঘন্টার হিসাব দেন।

আমি বললাম,

-শ্রীমঙ্গল, সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ সব যদি আপনাদের কাছে একই স্থানের নাম হয় আমি কি করবো; ঠিক আছে, সবাই যদি আন্দোলন খামিয়ে দেয় তাহলে আমি যেতে রাজি আছি; দুদিন না হয় ইলেকশনে কম সময় দিলাম।

সঞ্চালক বললেন,

-আরে আন্দোলন নিয়া ভাবার দরকার নাই, সাত জন না পাওয়া গেলে চারজনই যাবো; তারচেয়ে বলেন, আপনার এলাকার ইলেকশনের অবস্থা কি, জিতবে কে।

আমি বললাম,

-প্রার্থী হিসেবে আমার দলের প্রার্থী মারাত্মক জনপ্রিয়; বাকিটুকু ইলেকশনের পর বলা যাবে।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-পত্রিকায় দেখলাম বিরোধী দল অভিযোগ জানিয়েছে, সরকারি দল নাকি বিরোধী দলে ভাঙ্গন ধরিয়েছে।

আমি বললাম,

-তারা তো আর স্বীকৃত বিরোধী দল নাই; তারা কখনো বিরোধী দল হিসেবে চড়াই উৎরাই পার হয়নি; তাদের শুধু নালিশ আছে, কখনো ভাসুরের কাছে কখনো জ্যাঠালির কাছে কিন্তু আসলে তারা পর্বতসম বিরোধীদলীয় কর্মযজ্ঞের পাহাড়ের সামনে দাঁড়ালেই ভয় পেয়ে যায় আর ভাবে, এই পর্বত ডিঙ্গাবার ক্ষেত্রে তাদের কোন ভূমিকা রাখবার সম্ভবনা নাই, তখনই শুরু হয় পিছু হটবার প্রক্রিয়া।

সঞ্চালক বললেন,

-সকলে যদি আমাদের মৌলভীবাজার যাবার অনুমতি দেন, তাহলে একটি বিরোধী দলীর গল্প শুনিতে আজকের আসরের এখানেই সমাপ্তি টানতে চাই।

জমিদার নন্দন বলল,

-অনুমতি তো দিতেই হবে, তবে আপনাদের সিলেট যাবার প্রস্তাবের ওপর তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা সহ নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে আপনাদের যাবার অনুমতি দেয়া হল।

সঞ্চালক বাকি সবার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বললেন,

-এটাকে কি শুধু আমরা জমিদার নন্দনের অনুমতি হিসেবে দেখবো নাকি সকলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখবো এবং আপনারা আপনাদের বিরোধী দল মার্কা আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করলেন বলে ধরে নেবো।

গড়গড় আর গজগজ মার্কা শব্দ ব্যবহার করে সকলে বুলিয়ে দিল যে, তারা অনন্যপায় হয়ে অনুমতি দিল। যদি অন্য কোন উপায় থাকতো তবে এই পরিস্থিতিতে আন্দোলনের বিকল্প অন্য কোন পথ তারা বেছে নিতো না। সঞ্চালক মহোদয় একটু নড়েচড়ে বসে বললেন,

-তাহলে আমার গল্পটা শোনাই।

ডাক্তার বললেন,

-কি আর গল্প শোনাবেন; সিলেট থেকে ফিরে এসে প্রকৃতি নিয়ে কিছু কথা শোনাবেন ঞ্ণ।

সঞ্চালক বললেন,

-এই ইঞ্জিনিয়ার যতক্ষণ সাথে আছে ততক্ষণ কি আর প্রকৃতি-সৌন্দর্য্য নিয়ে মাথা ঘামানো যাবে।

ইঞ্জিনিয়ার বলে উঠলেন,

-আমারে নিয়া যখন এতো অসুবিধা তাইলে আমি বাদ যাইগা।

আমি বললাম,

-সেটা আবার কি কথা; মূল উদ্দোক্তা যদি না যায় তবে আর যাবার দরকার কি।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-জানেন নাকি, সেদিন ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে যেয়ে জীবনে প্রথম ইঞ্জিনিয়ারের ডাক্তারি দেখলাম; এরকম একজন ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তার সঙ্গে না থাকলে ভ্রমণ জনিত ব্যাপার স্যাপার বৃথা হয়ে যাবে।

ডাক্তার সাহেবের বোধহয় কথাটা গায়ে লাগলো। বিরক্তি ভাব নিয়ে বললেন,

-ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তার আবার কি জিনিষ?

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-মুভি, নাটক ইত্যাদি যখন আমরা দেখতে যাই তখন আমরা সকলে জেনেই যাই যে, মিথ্যা কিছু দেখতে যাচ্ছি; যারা মুভি বা নাটক তৈরী করে তারাও কিছু ঙ্গিত দিয়ে দর্শককে বুঝিয়ে দেয় ঘটনাস্থল কোথায়, কে কোন চরিত্র, সময় ইত্যাদি; এখন আমাকে বলেন, কোন একটা চরিত্রকে ডাক্তার বোঝাতে হলে আপনি কি করবেন?

ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে যেহেতু প্রশ্নটি করা হয়েছে তাই উত্তর দেবার দায়িত্ব নিজ ঘাড়ে নিয়ে ডাক্তার বললেন,

-সাদা এপ্রন পড়িয়ে দিয়ে গলায় স্টেথোস্কোপ ঝুলিয়ে দেবো।

ক্যামেরাম্যানকে সাধারণত আমরা খুব সিরিয়াস মানুষ হিসেবে গন্য করি এবং তার হাসি আমাদের কাছে এক দুর্লভ বস্তু, আজ বহু জনম পর তাকে হাসতে দেখলাম। ফিক করে একটা শব্দের সাথে মুখের কোনটা একটু বেঁকে যাওয়ায় আমি বুঝে নিলাম ওটা হাসি ছিল। সেই আধো হাসির ফাঁক দিয়ে তিনি বললেন,

-সেদিন ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাসায় যেয়ে দেখি, উনি নিজের গাড়ি স্টার্ট দিয়ে একটা সাদা এপ্রন পড়ে, কানে স্টেথোস্কোপ লাগিয়ে, সেই স্টেথোস্কোপ দিয়ে ইঞ্জিনের শব্দ শুনছেন।

ইঞ্জিনিয়ার আর থাকতে পারলো না,

-আরে মিয়ারা, আপনারা কি আমাকে কমেডিয়ান হিসেবে সিলেট নিবেন নাকি।

সঞ্চালক খুব গম্ভীর গলায় বললেন,

-মানুষকে হাসাতে পারাটা একটা বিশাল কাজ; তোমার মত মানুষের কমেডিয়ান হবার কোন সম্ভবনা নাই; তবে আমাদের কিছু কমেডি রিলিফ তুমি যে দিতে পারো, এটায় কোন সন্দেহ নেই।

জমিদার নন্দন বলে উঠলো,

-ভাই, আজকে তো কোন কমেডি রিলিফ পাইলাম না ওনার কাছ থেকে।

সঞ্চালক বললেন,

-জেনে বুঝে কমেডি রিলিফ তৈরী করা বুদ্ধিমানের কাজ, সে তো বুদ্ধিমান না।

ইঞ্জিনিয়ার আর চুপচাপ বসে থাকতে পারলেন না,

-ঐ মিয়া, তাইলে কি আমি গর্দভ।

সঞ্চালক বললেন,

-গর্দভ শব্দটা আমি উচ্চারণ করি নাই; তবে একটা কথা ঠিক, গর্দভেরা ভারবাহী হিসেবে কাজে আসে, তুমি কি কাজে আসো এপ্রন পড়া স্টেথোস্কোপ লাগানো ইঞ্জিনিয়ার।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

-ঐখানেই তো সমস্যা। সব চরিত্রকে একটা নির্দিষ্ট ধাঁচে ফেলাটা আমাদের চেতনার মধ্যে কাজ করে; রিকশাওয়ালা বা কৃষক বললেই মনের মাঝে হত দরিদ্র, ছেড়া লুপ্টী আর ছেড়া গেক্সীর কথা মনে আসবে; কৃষক হলে তো কথাই নেই, জামাটাও রাখা যাবে না গায়ে, একেবারে উদ্যম শরীর; বাস্তবে কয়জন পেয়েছেন আপনারা এই রকম কৃষক বা রিকশাওয়ালা; আমার কাজে পরিচ্ছন্নতা রাখতে আমি কাজের সময় সাদা এপ্রন ব্যবহার করি; আমার গাড়ির ইঞ্জিনে একটা খুটুর খুটুর শব্দ ছিল, সেই শব্দের উৎস খোঁজার জন্য আমি স্টেথোস্কোপ ব্যবহার করেছি; এখানে গর্দভ বা বোকার মত কোন কাজটা করলাম।

বাক্সাহ, ইঞ্জিনিয়ারের শুদ্ধ ভাষার দীর্ঘ বয়ানে বোঝা গেল সে খুব মাইন্ড করেছে। মাঝখান থেকে জমিদার নন্দন হাত তালি দিয়ে বলে উঠলো,

-হইছে হইছে, কাম হইছে, দলে ভাঙ্গন ধরছে। আমাদের ছাড়া যেতে চাইছিলেন, এখন যাওয়া বন্ধ; বিরোধী দল জয় যুক্ত হয়েছে, বিরোধীদল জয়যুক্ত হয়েছে, বিরোধীদল জয়যুক্ত হয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

-ঐ মিয়া, আপনে রুপিং দিবার কেঠা এইখানে; আপনারা মিয়া এখন মাজা ভাঙ্গা বিরোধী দল; তীর নিন্দা, নালিশ, প্রেস রিলিজ পাঠান, তীর প্রতিবাদ করেন, নাইলে নোট অব ডিসেন্ট দিয়া নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমান গিয়া।

এরমাঝে কোন সময় রাজনীতিবিদ ভাই ঘরে ঢুকেছেন সেটা আমরা কেউ খেয়াল করিনি। উনি বলে উঠলেন,

-যা করতেছেন আপনারা, বিরোধী দলের মাজা ভাঙ্গার মত কাজ করবেন, অথচ তাদের মাজা ভাঙ্গবেনা এটা কেমন কথা।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

-নিজের মাজার শক্তি সম্পর্কে আন্দাজ নাই, মাজা তো ভাঙ্গবোই।

রাজনীতিবিদ খুব গম্ভীর গলায় বললেন,

-যে ধরনের রাজনৈতিক খেলা আপনারা দেখাইতেছেন সেটা এতই মোটা দাগে করতেছেন যে, খালি চোখেই স্পষ্ট ধরা পরে আমাদের মত সাধারণ মানুষের কাছে।

ইঞ্জিনিয়ার সব সময় নিজেকে সাধারণ জনগনের প্রতিনিধি ভাবেন। কিন্তু আজ গর্দভেরও অধম বলাতেই কিনা জানিনা, নিজেকে আর এই আসরের সাধারণ জনগন ভাবতে পারলেন না। উত্তেজিত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন,

-রাখেন মিয়া আপনার জনগন; আপনারা যখন আড়াই বছর কারফিউ দিয়া দ্যাশ শাসন করলেন তখন জনগনের কথা মনে আছিল না; হ্যা-না ভোট, ১৯৭৯ সালের অদ্বুত সংসদ নির্বাচন দিয়া জনগনেরে বাইরে রাইখা ভোট কইরা বিরোধীদলের নাম নিশানা মুইছা দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন, তখন জনগন আছিল কই? স্বাধীনতা বিরোধীদের নিয়া সরকার গঠন, তাদের হাতে দেশের পতাকা দেওয়া, তাদেরকে দেশের প্রধানমন্ত্রী বানানো, এইসব সময় জনগনের কথা তো ভুইলাই গেছিলেন; ৭৫ পরবর্তিতে অবৈধ ক্ষমতা নিয়া ইনডিমনিটি আইন কইরা খুনী গুলারে রাষ্ট্রের বড় বড় পদে চাকরি দিলেন, আর যখন সারা দেশেরে জেলখানা বানাইলেন, ২০০১ সালে যখন আবার স্বাধীনতার পক্ষের সকলেরে গায়েব করা শুরু করলেন কিংবা ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট যখন গনতন্ত্রের মাজা ভাঙ্গছিলেন, তখন জনগন আছিল কই; আপনাদের স্বভাবই হইল সাদা কালো একটা বিষয় নিয়া রঙ্গের খেলা শুরু করেন কিন্তু সেইটাতে আপনারা কোন দিন সফল হইতে পারেন নাই, পারবেনও না; একটা জেরার রঙ্গীন ছবি তুইলা আমারে দেখাইয়েন তো দেখি পারেন কিনা।

রাজনীতিবিদ বললেন,

-এই যে, আপনাদের স্বভাবখানাও দেখেন; কিছু হইলেই দৌড় মারেন ইতিহাসের কাছে; আরে ভাই, ইতিহাস অতীতের বিষয়; আমরা বর্তমান নিয়ে কথা বলছি।

সঞ্চালক মনে হল এইমাত্র তার ধ্যান ভেঙ্গে জেগে উঠে বসলেন, বললেন,

-শান্তি শান্তি। মিস্ত্রির সাংসারিক সমস্যা হইছে নাকি আজকে সকালে, অতো ক্ষিপ্ত কেন, এই ক্লাবে রাজনৈতিক আলাপ নিষিদ্ধ।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-আপনার এই কথাটা সব সময়ই আমার খুব কানে লাগে, রাজনীতি মানেই হল মানুষের জন্য কিছু করা, আমরা মানুষ সামাজিক সংঘবদ্ধ প্রাণী এবং সেটা কালের ইতিহাসের পাতায় প্রমানিত, তার মানে আদি ও অন্তহীন ভাবেই মানুষ ও রাজনীতি অঙ্গঙ্গী ভাবে জড়িত; আর এই ভাবনা ক্লাবে আমরা যে প্রসঙ্গের আলাপই করিনা কেন, মানুষ নিয়েই আলাপ করি, মানুষের জন্যই আলাপ করি; অতএব, আমাদের সব আলাপের মাঝেই রাজনীতি আছে; আপনি বরং বলতে পারেন, সরাসরি রাজনৈতিক কোন প্রসঙ্গে আলাপ করা যাবে না।

সঞ্চালক বললেন,

-আচ্ছা হইলো, আপনার কথাই রইলো; নো সরাসরি রাজনৈতিক আলাপ; রাজনীতিবিদ সাহেবের বলে রাখি একটা কথা, ইতিহাস ছাড়া বর্তমান নেই ভবিষ্যতও নেই, আর যদি ফোর্থ ডাইমেনশনে যান তাহলে তো ভবিষ্যতও ইতিহাস হয়ে যাবে।

রাজনীতিবিদ বললেন,

-সেটা আবার কি ভাবে সম্ভব।

সঞ্চালক বললেন,

-কিভাবে সম্ভব সেটা সম্পর্কে আমার ব্যাখ্যা শুনতে চাইলে চলেন তাহলে আমাদের সাথে সিলেট; ওখানে লম্বা আলাপ হবে, এখন আমার কাজ আছে; এই অল্প সময়ে চতুর্মাত্রিক কোন আলাপ সম্ভব না বরং আমার গল্পটা বলে আমি বিদায় নেই; সিলেট থেকে ফিরে এসে আগামী শনিবার বিস্তারিত আলাপ করবো।

জমিদার নন্দন বললেন,

-বলেন বলেন, আপনার বিরোধীদলীয় গল্প বলেন; আজকে আমরা যখন বিরোধীদল, আপনার গল্প শুনে তীব্র প্রতিবাদ করবার ভাষা পেলে করবো সেই অনুমতি দিয়ে গল্প শুরু করেন।

সঞ্চালক বললেন,

-তীব্র প্রতিবাদ করবেন সেটার জন্যও অনুমতি নিয়ে রাখলেন, ভাল ভাল, খুব ভাল; আপনারা কেউ গেম থিয়োরীর গল্প শুনেছেন কি।

আমাদের ডাক্তার সাহেব থিয়োরী শব্দটা কোনখানে পেলেই বোধহয় সেটার ওপর একটু চোখ বুলিয়ে নেন, উনি বললেন,

-সে তো বিশাল থিয়োরী; গেম থিয়োরীর দুই ধারাকে এক করে আপনি এখন গল্প শুরু করলে তো অনেক সময় লাগবে।

সঞ্চালক সাহেব বেশ ধীর স্থির ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসতে বসতে বললেন,

-নাহ ডাক্তার সাহেব, ছোট করে ফেলবো, আমরা তো আর থিওরী নিয়ে কথা বলবো না।

আজ শুরু থেকে এক কাপ কফি, চা, সিঙ্গারা কিছুই আসেনি কিন্তু এই নিয়ে কেউ নালিশও করেনি। সকলেই হয়তো ক্লাবের সিলেট যাওয়ার বিভক্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে চিন্তিত। সেই চিন্তার কারণেই হোক আর অন্য যে কোন

কারনেই হোক, থিওরী কপচানো হবে শুনে সকলের কপালেই চিন্তার একটা বলী রেখা ফুটে উঠলো এবং আরো অবাক করা বিষয় হল, নিজের অজান্তেই সকলে সঞ্চালকের দিকে একটু ঝুঁকে বসলেন যেন। এই অতি আগ্রহ বোধহয় সঞ্চালকের পছন্দ হলো না। সে বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বললো,

-আজকে মিস্ট্রী ব্যাটা নিজেকে শুধু গর্দভের অধম বলেই চিহ্নিত করেনি, অসামাজিক জীব হিসেবেও চিহ্নিত করেছে।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের এমনিতেই আজ মন খারাপ। ক্লাবের জন্য একটা সুখবর নিয়ে এসে ক্লাবের বিভক্তি বোধহয় তার মনের গহীণে খোঁচা মারছিল সারাঞ্জন, যে কারণে চুপচাপ বসে ছিল। সঞ্চালকের এই কথায় তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে বললো,

-আমার বিরুদ্ধে পরিচালিত সব ষড়যন্ত্রের জাল ছিঁড়ে ফেলবো; কি পাইছেন আপনারা; গর্দভ, অসামাজিক এইসব শব্দ আমার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার অর্থ হইলো আমাকে এই ক্লাব থেকে নিশ্চিহ্ন কইরা দেওয়া; এখন থাইক্কা আমার নামে কোন বিশেষণ প্রয়োগ করতে হইলে আগে কারন দর্শাইতে হবে; নাইলে আমি হরতাল ডাকমু। সঞ্চালক মহোদয় ইঞ্জিনিয়ারের রাগ বোধহয় খুব উপভোগ করছিলেন। ঠোঁটের কোনে একটা মিটিমিটি হাসি নিয়ে বললেন,

-অসামাজিক না হইলে আজকে এতক্ষণেও এককাপ কফি, সিঙ্গারা কিছুই পাইলাম না কেন।

ইঞ্জিনিয়ার আর কথা না বাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

-স্যরি স্যরি, আমার আসলে খুব মন খারাপ হইয়া গেছিলো; আমি যাই, কাম আছে কিছু; সিঙ্গারা-কফি পাঠাইতেছি; আর সিলেটের সাতটা টিকেটের মধ্যে দুইটা টিকেট ফেরত পাঠাইতেছি, একটা এক্সট্রা রাখলাম, কেউ যদি যাইতে চান, ক্লাইট টাইম সকাল দশটা, মঙ্গলবার; সকাল নয়টার মধ্যে সকলে এয়ারপোর্ট থাইকেন; সিলেটে যার গাড়ি আর যার থাকার বন্দোবস্ত করার কথা, কইরা রাইখেন; এই বয়সে, এই শীতের দিনে খোলা আকাশের তলায় ঘুমাইতে পারুম না।

ইঞ্জিনিয়ার বেরিয়ে যাবার পর সঞ্চালক খুব মোলায়েম স্বরে বললেন,

-ব্যাটা মিস্ট্রী আসলেই খুব ভাল মানুষ।

জমিদার নন্দন বললো,

-মানুষ ভাল না হইলে কি তার নিজের অফিসের একটা রুম ছাড়ে, আর প্রতি শনিবারে আমাদের অত্যাচার সহ্য করে।

কথা অন্যদিকে প্যাঁচ খাবার আগেই সঞ্চালক বলা শুরু করলেন,

-ডাক্তার সাহেব তো গেম থিওরী সম্পর্কে ভালই জানেন; আর কে কে জানেন সেটা নিয়ে আর কথা বাড়াই না; গেম থিওরীকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এক, প্রতিযোগীতা মূলক; দুই, সহযোগীতা মূলক; দুই ভাগই আবার মানুষের একে অপরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল। প্রথমটার উদাহরণ হিসেবে যেটা বহুল ব্যবহৃত হয় সেটাকে বলে “কারাবন্দি পরিস্থিতি”; ধরেন দু’জন মানুষ একটি অপরাধ মূলক কাজ করে ধরা পরলো; ঐ দু’জন মানুষের একে অপরের প্রতি আস্থা-বিশ্বাস কম, কারন, অপরাধ সংঘটিত করার আগে তাদের পরিচয় খুব বেশী দিনের নয়, অপরাধটি সংগঠিত করার জন্যই তারা ঘটনাচক্রে এক হয়েছে; ধরা পরবার পর আইন অনুযায়ী তাদের শাস্তি হবে ধরে নেই দুই বছর, কিন্তু সংঘটিত অপরাধটি বিচারক মহোদয়ের খুব অপছন্দ; তিনি মনে মনে চান যে তাদের শাস্তি আরো বেশী হোক।

সঞ্চালক বলে চলেছেন,



-মহামান্য আদালত অপরাধী দু'জন কে ডেকে পাঠালেন তার ব্যক্তিগত চেম্বারে, প্রস্তাব দিলেন, যদি তোমাদের একজন স্বীকার কর যে তোমরা অপরাধ করেছো, তাহলে যে ব্যক্তি স্বীকার করলো তাকে রাজ সাক্ষী হিসেবে মেনে নিয়ে ছেড়ে দেয়া হবে, কিন্তু যে স্বীকার করলো না তাকে দশ বছরের জেল খাটতে হবে; আর দু'জনেই যদি স্বীকার কর তাহলে দু'জনকেই পাঁচ বছরের জেল খাটতে হবে; আর কেউ যদি স্বীকার না কর তাহলে দু'জনকেই দুই বছরের জেল খাটতে হবে; আদালতের সময় বাঁচাতে এই সুযোগ তোমাদের দিলাম; এক ঘন্টার মধ্যে আমাকে জানাতে হবে। এই বলেই তিনি দুই অপরাধীকে আলাদা দুই রুমে নিয়ে একা একা রাখবার ব্যবস্থা করলেন। প্রতিযোগীতা মূলক গেম থিয়োরীর সূত্র অনুযায়ী চারটি বিকল্প দেয়া হল, যেখানে একটি বিকল্পে রয়েছে পুরস্কারের ব্যবস্থা; যেহেতু অপরাধী দু'জনের একে অপরের প্রতি আস্থা নেই, সুতরাং, ৯৯% সম্ভবনা তারা দু'জনেই দোষ স্বীকারে করবে এবং দু'জনেই পাঁচ বছরের জেল খাটবে।

সঞ্চালকের গেম থিয়োরীর প্যাচাল চলছে তো চলছেই,

-গেম থিয়োরীর দ্বিতীয় ভাগ, অর্থাৎ, সহযোগীতা মূলক গেম থিয়োরীকে বোঝার সুবিধার জন্য এখানেও দু'জনকে টেনে আনি; ধরে নেই এই দু'জন মানুষের মূল জীবিকা হল বিস্কুট বানিয়ে বিক্রি করা, তাদের একজন দিনে দশটি বিস্কুট তৈরী করতে পারে, আরেকজন বিশটি বিস্কুট তৈরী করতে পারে, অর্থাৎ, দু'জনের সম্মিলিত বিস্কুট তৈরীর ক্ষমতা দিনে ত্রিশটি; কিন্তু দেখা গেল, দু'জন যখন এক হয়ে বিস্কুট তৈরী করা শুরু করে, তখন তারা ত্রিশটির যায়গায় চল্লিশটি বিস্কুট তৈরী করতে পারে; দু'জনের মাঝে লভ্যাংশ ভাগ করবে এখন কি ভাবে; থিয়োরী হল, সম্মিলিত প্রচেষ্টার কারণে যেটুকু বেশী বিস্কুট তৈরী হল তার অর্ধেক দু'জনে সমান ভাগে ভাগ করে নেবে, অর্থাৎ, এখানে প্রথম জন পাবে ১৫টি বিস্কুটের লভ্যাংশ, দ্বিতীয়জন পাবে ২৫টি বিস্কুটের লভ্যাংশ।

রাজনীতিবিদ বললেন,

-আপনি বললেন বিরোধী দলীর গল্প শোনাবেন কিন্তু এখানে বিরোধী দল কোথায়।

সঞ্চালক বললেন,

-আমাদের ক্যামেরাম্যান ভাই একটু আগেই বলেছেন, মানুষ সামাজিক প্রাণী, সমাজ চিন্তা মানেই রাজনৈতিক চিন্তা; এটাও সমাজ চিন্তা, সুতরাং, আমরা ধরেই নিতে পারি এখানে রাজনীতি আছে; প্রতিযোগীতা মূলক গেম থিয়োরী অনুযায়ী নিজেদের মাঝে একে অপরের প্রতি আস্থা-বিশ্বাস না থাকার কারণে বিরোধীদল পরাজিত; আবার সহযোগীতা মূলক গেম থিয়োরী, অর্থাৎ, বিস্কুট ভাগাভাগির থিয়োরীতেও বিরোধী দল পরাজিত; বিরোধীদল যতই বলুক তাদের দাঁড়াবারই সুযোগ দেয়া হয়নি, তাদের আগে বুম্বতে হবে, পৃথিবীর সকল দেশেই রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রতিপক্ষকে না দাঁড়াতে দেবার বন্দোবস্ত করার জন্য।

রাজনীতিবিদ বললেন,

-আপনি তো বিস্কুট আর কারাবন্দীর অলীক উদাহরণ দিলেন, আমাদের দেশের বাইরের একটা উদাহরণ দেন তো দেখি।

সঞ্চালক বললেন,

-আমাদের দেশই বা বাদ যাবে কেন; যারা এখন এসব অদ্ভুত কথাবার্তা বলছে, ২০০১-০৬ পর্যন্ত তারাই সবচেয়ে নোংড়া ভাবে এর প্রয়োগ করেছে; দেশের বাইরের উদাহরণ চাইলেও হাজারে হাজারে দিতে পারবো; যেমন, সহযোগীতা মূলক গেম থিয়োরীর উদাহরণ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বহুল ব্যবহৃত; যত আঞ্চলিক জোট দেখা যায় তার সবই এই থিয়োরীকে মেনেই করে, যেমন চীনের ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড; তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের গত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথাই ধরা যাক; প্রথমে হিলারী ড্রাম্পের বিরুদ্ধে এক'শো অভিযোগ এনেছেন, ঐ এক'শো অভিযোগের মাঝে দশটি অভিযোগে হয়তো মিথ্যা বা ভুল তথ্য ছিল; ড্রাম্প তার নির্বাচনী প্রচারণার প্রথম দিকে শুধু ব্যস্ত থাকতেন ঐ দশটা মিথ্যা অভিযোগকে মিথ্যা বলার জন্য; পরবর্তিতে ড্রাম্প তার স্ট্র্যাটেজি বদলালেন; হিলারীর বিরুদ্ধে হাজারো আবেল তাবোল মিথ্যা বলা শুরু করলেন, এখন পাশার দান উলটে গেল;

হিলারী আর কি অভিযোগ করবেন আর কি প্রচারনা চালাবেন, ট্রাম্পের মিথ্যা গুলো ঝুণ্ডন করতে করতেই দিন শেষ এবং অবশেষে তার পরাজয়।

জমিদার নন্দন আর থাকতে পারলো না। তিড়িং করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলা শুরু করলো,

-ঠিক কথা ঠিক কথা, একদম ঠিক কথা; ভাই, উকিলেরা এই কাজই করে; আমার প্র্যাকটিকাল অভিজ্ঞতা আছে; একজন উকিল যখন কোন মামলা নেয় তখন বেশীরভাগ সময় জেনেই মামলা নেয় যে, সে সত্যের পক্ষে লড়াই করছে নাকি মিথ্যার পক্ষ নিয়ে আইনের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছে; যদি সে মিথ্যা মামলা নিয়া থাকে তাইলে করে কি জানেন? শুরু করে প্রতিপক্ষ বাদী বা বিবাদীর ওপর আক্রমণ; আজোবাজে মিথ্যা দিয়া এক্কেবারে আর্থেপুর্থে প্যাঁচাইয়া ফেলায়, আপনার থিয়োরীর সাথে একদম হুবাহুব মিল আছে ভাই।

সঞ্চালক বললেন,

-দিলেন তো থিয়োরীর বারোটা বাজাইয়া; আরে ভাই, উদাহরণকে থিয়োরীর সাথে মিলালে তো কখনোই থিয়োরীর পক্ষে কোন বিশ্বাস যোগ্য সূত্র দাঁড় করাতে পারবেন না; এইখানে উদাহরণটা আপনার অভিজ্ঞতার সাপোর্টে কথা বলছে, থিওরী না; এই ক্ষেত্রে আপনার উল্লেখিত উকিল যেহেতু জানে যে, হারাবার তার কিছু নেই, তাই যে কোন মুহুর্তে সকলের সামনে সে তার নিজের জামা কাপড় খুলে ফেলতে পারে; এই আক্রমণাত্মক চড়াও হবার মূল তত্ত্ব কথা হল, সে জানে যে সে নিজে সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না; সে আক্রমণাত্মক কথা বলা শুরু করলে প্রতিপক্ষের প্রথম কাজই হয়ে দাঁড়াবে আত্মরক্ষা মূলক অবস্থান নেয়া।

রাজনীতিবিদ বললেন,

-সরকারি দল গেম থিয়োরী না বুঝলেও থিয়োরীর উদাহরণটা বেশ ভালই বুঝেছে, হারাবার কিছু নেই বুঝে গনতন্ত্রের উপরই আক্রমণ করে বসেছে।

সঞ্চালক বললেন,

-গনতন্ত্র নিয়ে আমরা বহুবার আলোচনা করেছি, আজ না হয় না করি।

রাজনীতিবিদ বললেন,

-কেন, আলাপ করতে ভয় পাচ্ছেন কেন, যুক্তি খুঁজে না পেলে আক্রমণাত্মক কথা বলা শুরু করবেন না হয়।

সঞ্চালক তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

-ভাই, আমার আজকে সময় কম, অতএব কথা বাড়াবেন না; আমরা শুধু ট্রাম্পের সাফল্যটা কোথায় সেটা বিবেচনায় নেই; ট্রাম্পের প্রচারনা টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন তিনি নিজে, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন খুব তাড়াতাড়ি, এক্সিকিউট করেছে তার প্রতি আস্থা আছে এমন একটি বিশ্বস্ত টিম; আমাদের তথাকথিত বিরোধীদের ক্যাপ্টেন কে ছিল, সেই ক্যাপ্টেনের বিশ্বস্ত টিম মেন্সার কারা ছিল, সেটা তাদের নিজেদের কাছেই ছিল কুয়াশাচ্ছন্ন; সুতরাং, গেম থিওরীর প্রতিযোগীতা এবং সহযোগীতা, দুই ভাগেই তারা চূড়ান্ত ব্যর্থ হবে এটাই সাভাবিক।

জমিদার নন্দন খুব খুশী মনে টেবিলে বিশাল এক থাপ্পড় মেরে দিয়ে বললেন,

-ঠিক কথা, রাইট কথা, ক্যাপ্টেন ছাড়া, টিম ছাড়া খেলতে নামছেন; লগে তো আছেই বর্তমান সরকারের উন্নয়ন চিত্র; আপনাদের বিপক্ষে ছিল নিকটাতীতের দুর্নীতি, অপশাসনের ভয়াবহ চিত্র, আর আন্দোলনের নামে শত শত মানুষ পোড়ানোর ইতিহাস; মানুষ ভোট দিতে যাবে কেন, এইটা নেগেটিভ বনাম পজেটিভের খেলা; পজেটিভের জয় হবেই।

রাজনীতিবিদ বললেন,

-এতোই যদি পজেটিভ থাকেন তাহলে সাধারণ মানুষকে ভোটটা ঠিক মত দিতে দিলেই পারতেন।

জমিদার নন্দন বললো,

-দেয় নাই বুঝলেন কি কইরা; সারা পৃথিবীর তাবৎ দেশে কইছে সুন্দর ভোট হইছে, দেশী বিদেশী সব নির্বাচন পর্যবেক্ষকেরা কইছে ভাল নির্বাচন হইছে; আপনারা তো নালিশের এক্সপার্ট, প্রমাণ হাতে থাকলে তাগো দেখাইলেই পারতেন।

রাজনীতিবিদ বললেন,

-আমি ভাই সাদা চোখে যা দেখেছি সেটাই বলছি, আমার ভোটটা আমি দিতে পারি নাই।

সঞ্চালক বললেন,

-পরিসংখ্যানের খাতায় ব্যক্তি আপনার অবস্থান অতি নগন্য; সার্বিক ভাবে সূষ্ঠ নির্বাচন সুসম্পন্ন হয়েছে।

রাজনীতিবিদ বললেন,

-আমি মানি না, আমার ভোট আমি দিতে পারলাম না আর আপনি বলছেন সূষ্ঠ ভাবে নির্বাচন সুসম্পন্ন হয়েছে, গনতন্ত্র কোথায় গেল?

সঞ্চালক একটু রুট স্বরেই বললেন,

-শোনে রাজনীতিবিদ সাহেব, গনতন্ত্রের অর্থ যদি শুধু নিজের ভোট দিতে পারার মাঝেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান তাহলে বলবো, সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে ছিয়ানব্বইয়ের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত এর চেয়েও মজার মজার গনতন্ত্র আমরা দেখেছি, মাগুরা নির্বাচনও দেখেছি; নব্বইয়ে ক'জনের টেলিভিশন ছিল আমাকে বলেন, অথচ ইলেকশনের আগের দিন টেলিভিশনে এমন কি বলা হয়েছিল যে, আপনারা ৯১'এর নির্বাচনের পরে প্রচার করা শুরু করলেন, ঐ এক বক্তৃতার কারণে তৎকালীন বিরোধী দল পরাজিত হয়েছে; সেসব নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচন শতগুণে ভাল হয়েছে; আপনার ভোট দিতে পারেননি বুঝলাম, সেটা তো সংসদীয় নির্বাচনের সৌন্দর্য; আমাদের দেশের গনতন্ত্রের ইতিহাসের পাতায় আমি অন্তত এক'শো উদাহরণ দিতে পারবো যেখানে একজন সংসদ সদস্য নিজেকে নিজে ভোট দিতে পারেননি, কারণ, উনি যে এলাকায় নির্বাচন করছেন সে এলাকায় ওনার ভোট ছিল না; আপনার ভোট কোন এলাকায় ছিল আমার জানা নেই; গনতন্ত্রে একজন দিন মজুরের বা ভূমিহীন কৃষকের যেমন এক ভোট, আপনারও তেমন এক ভোট, আপনি ভোট দিতে পারেননি বলে পুরো নির্বাচন বা গনতন্ত্র অশুদ্ধ হয়ে যেতে পারে না।

রাজনীতিবিদ বললেন,

-তাহলে গনতন্ত্রের শুদ্ধতার আপনার সংজ্ঞা দেন, শুনে রাখি একটু।

সঞ্চালক বললেন,

-আমার সংজ্ঞা শুনবেন কেন, সার্বজনীন সংজ্ঞাই শোনাচ্ছি, শুনে রাখেন, কাজে আসবে। গনতন্ত্র একটা চর্চা; হঠাৎ করে গনতন্ত্র টুপ করে আপনার কোলে এসে পরবেনা; সেই চর্চার মূল দায়িত্ব রয়েছে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের উপর; সেই প্রতিষ্ঠান গুলোর মাঝে রাজনৈতিক দল গুলো অন্যতম; আপনার দল কি জানতো না সামনে সংসদ নির্বাচন; আপনার দলের যে মাজা ভাঙ্গা সেটাও আপনার দলের জানা ছিল; তফসিল ঘোষনার দুই সপ্তাহ আগে আপনাদের হুশ হল যে, নির্বাচনে যেতে হবে; নেতৃত্ব দেবে কে? জানেন না; নীতিনির্ধারণী ফোরাম কারা? জানেন না; এতো অল্প সময়ের মাঝে জোড়া তালি দেয়া, মেয়াদোত্তীর্ণ রাজনীতিবিদ এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস নিয়ে আর যাই হোক একটি ইউনিট তৈরী করা যায়না।

রাজনীতিবিদ বললেন,

-সবই বুঝলাম তারপরও একটা কিন্তু থেকে যায়; সবসময় তো আপনিই গল্প শোনান, আজ আমি আপনাকে একটা গল্প শোনাই; আমার গ্রামের পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে গিয়েছে; ছোট বেলায় দেখেছি ঐ নদীতে সাঁতার

কাটাও এক দুঃসাহসিক কাজ, যেমন খড়স্রোতা তেমন গভীরতা, তেমনই চওড়া; আমার এক চাচা আমাকে খুব ভালবাসতেন, আমরা গ্রামে গেলেই উনি একটা ডিস্ট্রী নৌকা নিয়ে নদীর মাঝখানে যেয়ে পানিতে একটা নোঙ্গর ধরনের কিছু ফেলতেন যেটা নদীর তলদেশ ছুঁতে পারতো কিনা সন্দেহ, তবে নৌকাটা ভেসে বেশীদূর যেতে পারতো না এটা ঠিক; হাতের ছাতাটা ডান দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে আটকে রাখতেন, আর ছিপ ফেলে সারাদিন বসে থাকতেন, উদ্দেশ্য আমাকে তাজা মাছ ধরে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াবেন; আমার যতটুকু মনে পড়ে, চাচা কোনদিন নিজে মাছ ধরে খাওয়াতে পারেন নাই; তারপরও আমি যতবারই গ্রামে গিয়েছি ততবারই প্রায় প্রতিদিন উনি এই কাজ করতেন এবং আমরা যেদিন চলে যাবো সেদিন বাজার থেকে মাছ কিনে এনে খাওয়ার ব্যবস্থা করতেন; নদীর ঐ স্রোতে নৌকার দুলুণী আর ভেসে যাওয়ার মাঝে, ঐ ছিপ দিয়ে, ঐ গভীরতায় মাছ পাওয়া যে খুব কঠিন সেটা এখন আমি বুঝি; আমাকে বলেন, এরপরও তিনি ঐ কাজ করতেন কেন?

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-ভাইরে, একেই বলে বাৎসল্য, একেই বলে ভালবাসা।

রাজনীতিবিদ বললেন,

-আমিও তাই বিশ্বাস করতাম, এখনো করি কিন্তু কিছুদিন যাবত আমি এর উলটো পিঠও দেখা শুরু করেছি; আমার চাচাও জানতেন তিনি ঐখানে মাছ পাবেন না, আমাদের স্থানীয় ভাষায় বলে, মাছ ধরাটা ওনার একটা উচ্ছ্বাস; আসলে সারাদিনে নৌকার দুলুণীতে একটা ঝিমুণীও হল, আমার প্রতি ওনার ভালবাসার বহিঃপ্রকাশও হল; এবার আমার গল্পের সাথে মিলিয়ে নিন সমসাময়িক প্রসঙ্গ গুলো।

সঞ্চালক বললেন,

-যা বুঝাতে চেয়েছেন মেলাতে পারলাম না; আপনি বোধহয় বলতে চেয়েছেন, আপনার চাচা যেমন জানতেন ওখানে মাছ পাওয়া যাবে না তারপরও আপনার প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ দেখাবার জন্য সারাদিন ছিপ ফেলে বসে থাকতেন, তেমনি আপনার দলও ফল পাওয়া যাবে না জেনেও গনতন্ত্রের প্রতি ভালবাসায় নির্বাচনে গিয়েছিল।

রাজনীতিবিদ বললেন,

-আমি একটা গল্প শুনিয়েছি, সারমর্ম আপনিই দিলেন।

সঞ্চালক বললেন,

-সারমর্ম আমি এখনো দেইনি; আমি শুধু খোঁজার চেষ্টা করছি এই গল্প দিয়ে আপনি কি বোঝাতে চাইছেন; আমার সারমর্ম হল, আপনারা জানতেন আপনারা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধ্বংসের মুখোমুখি; নির্বাচন নির্বাচন ভাব ধরে মেয়াদোত্তীর্ণ কিছু রাজনীতিবিদ সঙ্গে নিয়ে কিছুক্ষণ অলস সময় কাটালেন পরবর্তী মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায়।

রাজনীতিবিদ কিছুটা অসিহস্কু কণ্ঠে বললেন,

-কাকে আপনি মেয়াদোত্তীর্ণ, মাজাভাঙ্গা বলছেন বারাবারে, কেন বলছেন।

সঞ্চালক বললেন,

-কেন, কাদের সিদ্ধিকীর কাথাই ধরুন, আরও কিছু নাম শুনতে চাইছেন নাকি; শালীনতা, শিষ্টাচারের বাইরে যেতে চাইছি না দেখে অন্য কোন শব্দ ব্যবহার করছি না; যাদের নিয়ে আপনারা মাঠে নেমেছিলেন তারা প্রাকৃতিক ভাবে রাজনৈতিক অক্ষমতা সম্পন্ন, রাজনীতির মৌলিক চাহিদা তারা কখনোই পূরণ করতে পারবে না; তারা না পারবে গনতন্ত্র উৎপাদন করতে, না পারবে আন্দোলন উৎপাদন করতে; তাছাড়া আপনার দলকে তো আমি রাজনৈতিক দলই মনে করি না; তারা একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তির একত্রিত হয়েছে; ঐ প্ল্যাটফর্ম যদি আরও কিছু একই ধরনের নপুংশক প্ল্যাটফর্মের সাথে যোগ দিয়ে আরেকটি প্ল্যাটফর্ম বানাবার চেষ্টা করে, তবে রাজনৈতিক দলের অংকে শূন্য যোগ শূন্য ইকুয়ালটু শূন্যই থাকবে।

রাজনীতিবিদ বোধহয় খুব আহত হলেন এসব কথায়, মুখ গোমড়া করে বললেন,

-জনগন এধরণের অন্যায় মেনে নেবে না।

সঞ্চালক বললেন,

-শোনে রাজনীতিবিদ, রাজনীতির মাঠে জনগন একটি সহায়ক শক্তি, আর রাজনৈতিক দল গুলো হল একে একটি প্রতিষ্ঠান; রাজনৈতিক দলগুলোর দায়ীত্ব জনগন নামের সেই সহায়ক শক্তিকে সংগঠিত করা; আপনারা সেই সংগঠিত করার কাজটি না করে সময় নেই অসময় নেই শুধু জনগনের নাম বিক্রি করার চেষ্টা করে চলেছেন; মনেই রাখেন না যে, রাজনৈতিক সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয় জনগনের ভালর জন্যই; আপনারা গনতন্ত্রের প্রতি ভালবাসায় যে নির্বাচনে জাননি সেটা একটা বাস্চা ছেলেও বুঝেছে; তবে আপনারা যেটা বোঝেন নাই সেটা হল, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে যা করলে দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য ভাল হবে সেটাই করা হয়েছে।

রাজনীতিবিদ বললেন,

-আমরা সবাই মনে করি পাহাড়ে ওঠার কাজটাই কঠিন, ভুলে যাই যে, ঐ পাহাড় থেকে এক সময় নামতে হবে এবং নামার কাজটাও একই রকম কঠিন।

সঞ্চালক বললেন,

-নিজের চরকায় তেল দেয়া ভাল, গনতন্ত্র নামের পাহাড়ে আগে ওঠেন, একবার যদি ঐ গনতন্ত্র নামের পাহারে উঠতে পারে তখন না হয় ঐ পাহারেই বসবাস করা শুরু করে দি যেন; আপনার গল্প অনুযায়ী আপনারা তো ছাতা হাতে এখনো ঝিমুচ্ছেন আর টাইম পাস করছেন; ভাই, আমার উঠতেই হবে এখন, থিওরী সব গোল্লায় যাক; আগামী মঙ্গলবার যারা সিলেট যাবেন তাদের সাথে সকাল নয়টায় দেখা হচ্ছে এয়ারপোর্টে, আর যারা যাচ্ছেন না তাদের সাথে দেখা হবে আগামী শনিবার ইনশাআল্লাহ; আমার কাজ আছে ভাই, আজকের মত বিদায়।

আমি বললাম,

-আমি যাচ্ছি সিলেট।

আর কেউ দেখি কিছু বলছেন না। বুঝলাম গেম থিওরীর দুই পথের দুটোই আমাদের ক্লাবে আজ উপস্থিত। নিজের প্রতিই হয়তো সকলের আস্থা-বিশ্বাসের সংকট দেখা দিয়েছে, আর নিজেদের মাঝে সহযোগীতায় অতিরিক্ত লাভের ভাগ বাটোয়ারার প্রশ্ন তো বহুত দুরস্ত। ভাবনা ক্লাবের এই ভাঙ্গন যাতে দীর্ঘস্থায়ী না হয় এই আশা নিয়ে চলে এলাম ক্লাব থেকে। আগামী পরশু ভাবনা ক্লাব সিলেট পৌঁছাবে।

## সিলেটের পথে

এসে গেল মঙ্গলবার। শীতের কুয়াশা ভেজা সকালে বিছানা ছাড়তে মন চায় না। তারপরও ছাড়তে হল বিছানার আলিঙ্গন। সকাল আটটার দিকে রওনা হলাম এয়ারপোর্টের পথে। সিলেট যাচ্ছে আমাদের ভাবনা ক্লাব। জ্বালাতন আর কাকে বলে, এই সকালেও ঢাকা শহরের অস্বাভাবিক ট্রাফিক দেখে তো দুঃশ্চিন্তাতেই পরে গেলাম, আদৌ সময় মত এয়ারপোর্ট পৌঁছাতে পারবো কিনা সেটা এক অমিমাংসিত সংশয়াচ্ছন্ন বিষয়। মনে একটা আশা, কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ ঠেলে প্লেন বাবাজি (ওহ নাহ, প্লেনকে তো ভাষাবিদগণ আবার স্ত্রী লিপ্সের কাতারে ফেলেছেন, মাজি বলা উচিত) উড়বেন না।

আমি ঢাকার ট্রাফিক নিয়ে সব সময়ই ভাবি। আমাদের সিলেটের মত একটি জেলা শহরও সময় মেনে বিভিন্ন রাস্তাকে একমুখী করে ভয়াবহ ট্রাফিক সমস্যাকে বেশ নিয়ন্ত্রনে এনেছে কিন্তু ঢাকা দিনকে দিন নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাচ্ছে। কেন যে উত্তর-দক্ষিণ এবং পূর্ব-পশ্চিমের দু'একটি রাস্তা ওয়ান ওয়ে করা যাচ্ছে না। কয়েকটা ওভার

পাস, আন্ডার পাস, ইউলুপ খুবই জরুরী। বিভিন্ন স্পীডের বাহন, জনপরিবহনের যত্রতত্র স্টপেজ ও সংখ্যা স্বল্পতার সমাধান সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয়তো। হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ আর অনুদান বিদেশ থেকে আসে শুধু ঢাকার ট্রাফিক সমস্যা সমাধানে কি করা যায় সেসবের ট্রেইনিং, গবেষণার জন্য। ফ্লাই ওভার থেকে শুরু করে সবই তো হচ্ছে, তারপরও সমাধান নেই কেন। আর রাইড শেয়ারিং তো আমার কাছে একটা হেয়ালীতে ভরা ধাঁধা। আগামীতে ভাবনা ক্লাবের কোন আসরে ধাঁধাটা উপস্থাপন করতে হবে। আমার পরিচিত কারো গাড়িই রাইড শেয়ারিং কোম্পানীতে কাজ করে না। তাহলে এই যে ১০/১২ হাজার গাড়ি চলছে, এরা কারা।

এসব ছাই-পাশ ভাবতে ভাবতে কখন সময় গড়িয়ে গিয়েছে বুঝিনি। সাড়ে নয়টার সময়েও যখন বনানী ফ্লাইওভারের ট্রাফিকে আটকে থাকলাম, শীতের সকালেও রিতিমত ঘাম ছুটে গেল। ঠিক তখনই ফোন এলো ইঞ্জিনিয়ারের। ইঞ্জিনিয়ার সিলেটি ভাষা রপ্ত করার চেষ্টায় আমাকে প্রথমেই জিপ্তেস করলো,

-কিতাবা সিলেটি পলিটিশিয়ান, যাইতায়নাইনি আমরা লগে।

আমি বললাম,

-যাবার ইচ্ছায় তো বিগত দেড় ঘন্টা রাস্তায় আছি, এখনো বনানী রেল ক্রসিং, দশটার মধ্যে না পৌঁছাতে পারলে কিছু মনে কইরেন না।

ইঞ্জিনিয়ারের আবার সেই হাস্যকর সিলেটি হবার চেষ্টা,

-আইওবা, প্লেন লেট খরবো কমপক্ষে এক ঘন্টা, আমরা তিন জন আইছি।

আর কথা বাড়তে না দিয়ে ফোন রেখে দিয়ে নিশ্চিত মনে হেলান দিয়ে বসলাম। ইঞ্জিনিয়ারের অদ্ভুত সিলেটি মাত-কথা শুনে একটা গল্প মনে পড়লো। বহুদিন আগে, বোধহয় ১৯৮৫-৮৬ সালের ঘটনা, তখন ড্রাইভার কোন কারনে না আসলে আমি বাবাকে গাড়ি চালিয়ে বিভিন্ন যায়গায় নিয়ে যেতাম। সেদিন সকালেও আমি আর বাবা বের হয়েছি। গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় আমাদের ইঞ্জিনিয়ারের মত আধো সিলেটি ভাষায় একজন এগিয়ে এসে তার দুঃখের গল্প শুরু করলো। সে ঢাকায় এসেছে, তার সব কিছু হারিয়ে গিয়েছে, এখন বাড়ি ফিরবার টাকাটাও নেই, কাল থেকে কিছু না খেয়ে আছে। বাবা শুধু জিপ্তেস করলেন, তোমার বাড়ি কই। লোকটি একেবারে আমাদের উপজেলার নাম বললো। বাবা তাকে পকেট থেকে পাঁচশো টাকা বের করে দিলেন।

তখন টগবগে তরুন রক্ত আমার। গাড়িতে উঠেই বাবাকে বললাম, লোকটা মিথ্যা কথা যে বলছে এটা পরিষ্কার, আপনি তার উপকার করতে চান, ৫০-১০০ টাকা দিতে পারতেন, একেবারে পাঁচশো টাকা দিয়ে দিলেন, লোকটা আমাদের বোকা বানিয়ে হয়তো মনে মনে হাসছে এখন। বাবা হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, বেচারার আমার কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশায় সিলেটি ভাষা শেখার চেষ্টা করছে, আমার উপজেলার নাম শিখেছে, আমার তো মনে হয় তাকে এক হাজার টাকা দিলেও কম হয়ে যেতো। সেই থেকে কেউ সিলেটি ভাষায় কথা বললেই, কোন সহযোগীতা করতে না পারলেও অন্তত তার কথা মনযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করি।

একসময় ঢাকা এয়ারপোর্ট পৌঁছে গেলাম। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি তখনও দশটা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি। অর্থাৎ, বনানী ফ্লাই ওভার থেকে এয়ারপোর্টে আসতে দশ মিনিটের মত লেগেছে। ঢাকার ট্রাফিক চরিত্রও আসলে কুয়াশাচ্ছন্ন হেয়ালীতে ভরা, কখন আটকে যাবে আর কখন যে দৌঁড়াবে নিশ্চিত নয়। এয়ারপোর্ট টার্মিনালের ভেতরে যেয়ে দেখি আমরা চারজনই মাত্র এসেছি, আমি, ইঞ্জিনিয়ার, ক্যামেরাম্যান, সঞ্চালক। আমার বোর্ডিং পাসও তারা নিয়ে নিয়েছে। হাতের ছোট্ট ব্যাগ ছাড়া কারো কোন লাগেজ নেই। চারজন গল্প করতে করতে বোর্ডিং এরিয়ার দিকে রওনা হলাম। প্লেন ছাড়তে আরও কমপক্ষে ঘন্টা দুয়েক বাকি, ওখানে বসেই চা কফি কিছু খেয়ে নেয়া যাবে।

এই শীতের সন্ধ্যায় আমাদের দলটির সকলেই খুব ঠান্ডা। কেউই কথা বলায় কোন আগ্রহ দেখাচ্ছে না। দুঃখ দুঃখ ভাব নিয়ে আমিই প্রথম মুখ খুললাম,

-আমাদের সাথে আর কেউই যাচ্ছে না?

ইঞ্জিনিয়ার উত্তর দিলেন,

-হক্কলের ফোন বন্ধ।

আমি বললাম,

-জমিদার নন্দন শুধু ঘুমের জন্য এরকম একটা ম্যারাথন আড্ডা মিস করলো, অদ্বুত কথা।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-ভাই, সমালোচনা খুব সহজ কাজ; আমার মতে তার না যাবার পেছনে বিস্ময়কর এক মানব মেকানিজম কাজ করেছে।

আমিও বিস্ময় ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললাম,

-শব্দ চয়ন ঠিক আছে তো, শব্দটা “বিস্ময়” ব্যবহার করেছেন।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-শব্দটা বিস্ময়ই; যে কোন সিদ্ধান্ত নেবার সময় মানুষের ব্রেইন তার সিদ্ধান্ত নেবার অপশনগুলোকে মাত্র দুটিতে নামিয়ে আনে, "হ্যাঁ" অথবা "না"; এরপর ব্রেইনের কাজ কমে গেল; মানুষের ব্রেইনের ডান আর বাম দিক সব সময়ই সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে বিপরিত মেরুতে অবস্থান করে; ডান দিকের অংশ যদি "হ্যাঁ" বলে তবে বাম দিকের অংশ "না" বলবেই; পরে দুই অংশ নিজদের মাঝে একটা আপোষ রফা করে অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে; এটাকে ব্রেইনের থিওরী অব প্রবাবিলিটি ফাংশন বলতে পারেন।

ইঞ্জিনিয়ার কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে হাঙ্কা স্বরে বললো,

-মারছে, ভাবছিলাম পাহাড় জঙ্গলে ঘুইরা বেড়ানো, প্রকৃতির কাছাকাছি যাইয়া একটু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করবু, কপাল আমার খারাপ, হইবো না হইবোনা, আমার সাধ না মিটিল আশা না পুরিল; এখনই থিওরী কপচাইতাছেন, সামনে কি আছে আল্লায় জানে; আইচ্ছা কন তো মিয়া ভাই, আপনার থিওরী অব প্রবাবিলিটি কি আমাদের আজকে সুন্দর ভাবে সিলেট পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে পারবে?

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-আপনার প্রশ্নটা যেই মুহুর্তে আমার ব্রেইন গ্রহন করার পর্যায়ে গেল, মনে রাখবেন, আমি কিন্তু মুহুর্ত শব্দটা ব্যবহার করছি, সেকন্ড বা মিনিট না; ব্রেইনের কর্ম পদ্ধতি অনুযায়ী সময়ের হিসেবে এই মুহুর্তটি হয়তো এক সেকন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগ সময়; গ্রহন করার মুহুর্তে ব্রেইনের সিদ্ধান্ত ছিল ৫০/৫০; পৌঁছাতে পারবো না এর পক্ষে ছিল ৫০%, পৌঁছাতে পারবোর পক্ষে ছিল ৫০%; তার পর মুহুর্তে আমার ব্রেইন হিসেব কষা শুরু করলো আমার অতীত অভিজ্ঞতা, প্লেন যাত্রা সম্পর্কিত আমার জ্ঞান ইত্যাদি দিয়ে; এরপর মুহুর্তে আমার ব্রেইনের থিওরী অব প্রবাবিলিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে পৌঁছাতে পারার পক্ষে ৯৯%; আর যদি শুধু থিয়োরী অব প্রবাবিলিটির কথা বলেন তবে কিন্তু ৫০% সম্ভবনা পৌঁছাবার এবং ৫০% সম্ভবনা প্লেন ক্র্যাশে মারা যাবার।

ইঞ্জিনিয়ার দ্বিতীয় কোন কথা না বলে উঠে দাঁড়িয়ে বোর্ডিং এলাকা থেকে বের হবার রাস্তায় হাঁটা ধরলেন,

-আমি সিলেট যাবু না; আমার মারা যাইবার কোন ইচ্ছাই নাই।

এতোক্ষণে সঞ্চালক মুখ খুলে বললেন,

-ঐ মিস্ট্রী থামলে ভাল লাগে।

ইঞ্জিনিয়ার থেমে বললেন,

-থামলাম, কি কথা আমার সনে।

সঞ্চালক বললেন,

-সামনের আলোটা খুব চোখে লাগছে; পাশের দেয়ালে যে সুইচটা আছে সেটা মনে হয় এই লাইটটার সুইচ, অফ কর তো।

ইঞ্জিনিয়ার সাথে সাথে সুইচটা অফ করলেন, লাইটটি নিভলো না। ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

-বুঝছি বুঝছি, আমরা ৫০% চাক্সের থিয়োরী অব প্রবাবিলিটি বুঝাইতেছো।

সঞ্চালক বললেন,

-আরে নাহ, এই যায়গায় সব সুইচবোর্ড মিলে একশোটা সুইচ আছে; ঐ সুইচে লাইটটা অফ হওয়ার সম্ভবনা এক পার্সেন্টেরও কম, এই রকম একটা অপরিচিত সুইচে হাত দেবার আগে তোমার অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে ব্রেইন হিসেব করে নিয়েছে যে, সুইচে হাত দিলে বিপদের কিছু নেই, কারণ, তুমি হয়তো সুইচে হাত দিয়ে কখনও শক খাও নাই; অথচ সুইচটা ত্রুটিযুক্ত হবার সম্ভবনা ছিল প্রচুর এবং ২২০ ভোল্টের শক খেয়ে তোমার মারা যাবার সম্ভবনা তো কমপক্ষে ৫০% ছিল; তুমি একটা অপরিচিত সুইচের উপর আস্থা রাখলা আর আমাদের সকলের প্রিয়, পরিচিত ক্যামেরাম্যানের ৯৯% সম্ভবনাকে উড়িয়ে দিয়ে আমাদের সাথে সিলেট যাবা না, এইটা কেমন কথা; সঠিক কাজ কি, সে বিষয়ে ততক্ষণ বিশ্বাস করা উচিত না যতক্ষণ সেই কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়া যাচ্ছে; আমাদের সাথে সিলেট না যাবার সিদ্ধান্তটি এসেছে তোমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত না হবার কারণে; পাহাড়ে জঙ্গলে দুই দিন ঘুইরা বেড়াইয়া কি উপলব্ধি করবা যদি গল্প আর আলোচনাই না থাকে।

ইঞ্জিনিয়ার গোমড়া মুখে ফিরে এসে চেয়ারে বসতে বসতে বললো,

-আমারে তো সেইদিন গর্দভেরও অধম বানাইছে সবাই; আমার বুদ্ধি কম, জ্ঞান কম, অভিজ্ঞতা কম ইত্যাদি আরও বহু কথা শোনার পূর্ণাঙ্গ মানসিক প্রস্তুতি আমার আছে।

সঞ্চালক বললেন,

-এই যে আরেক ফাউল কথা, বুদ্ধি, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা সব এক আস্থাকুড়ে নিষ্ফিষ্ট হইলো, এই সব শব্দের আলাদা আলাদা অর্থ আছে।

ইঞ্জিনিয়ার বিড়বিড় করে বললো,

-আমি প্লেন যাত্রায় মরতে রাজি আছি, তারপরও এতো গুতা সহ্য করুম না।

সঞ্চালক একটু রেগে গেলেন বোধহয়, বেশ কড়া গলায় বললেন,

-এক শয়তান ছাড়া যাত্রার সময়ে কেউ এই রকম মৃত্যু, দুর্ঘটনার সম্ভবনা নিয়ে কথা বলতে পারে আমার জানা ছিল না।

ইঞ্জিনিয়ার বোধহয় এবার আন্দোলনে নেমে গেল, জোড় গলায় শ্লোগানের মত বলে উঠলো,

-আমি শয়তান হইতেই পারি না, আমি চ্যালেঞ্জ দিয়া কইতে পারি আমি আগুন দিয়া তৈরী না।

ইঞ্জিনিয়ারের গলার চেয়ে এক কার্ঠি উপরের স্বরে সঞ্চালক বললেন,

-এই ব্যাটা আসলেই একখান শয়তান, একে বিতারিত করা হোক।

আমি বললাম,



-ভাই, এখন যদি আপনি এই শয়তান নামধারী ইঞ্জিনিয়ারকে বিতারিত করেন তবে কিন্তু সে নিজেকে প্রতারিত মনে করতে পারে।

সঞ্চালক বললেন,

-তাহলে তো আগে ইবলিশের বিষয়টা পরিষ্কার হতে হবে, কারণ, সেও তো নিজেকে প্রতারিত মনে করেছিল।

আমি বললাম,

-আমাদের যাত্রার সময় কখন সেটা এখনো বিমান কর্তৃপক্ষ জানায়নি, সুতরাং, হাতে অফুরন্ত সময়, বলে ফেলেন, আপনার ব্যাখ্যাটা শুনি।

Man proposes, God disposes. মানুষ ভাবে এক হয় আর এক। ঠিক সেই সময়ই ঘোষণা এলো আমাদের প্লেনে ওঠার। সঞ্চালক বললেন,

-সময়ের সাথে ভাবনা মিললো না; ইবলিশের সংক্রান্ত আলাপে কিছুটা ধর্ম বিষয়ক কথা যেহেতু চলে আসবে, সেহেতু ধীর স্থির মাথায় কথা গুলো বলা উচিত, নইলে বলতে চাইলাম এক হয়ে যাবে আরেক; রাত্রে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চা বাগানে বসে ঠান্ডা মাথায় আলাপ করবো ইনশাআল্লাহ।

২

উঠে বসলাম বিমানে। ছোট বিমান। খুব বেশী হলে চল্লিশ জনের বসার যায়গা আছে। এক সারিতে দুটো দুটো করে মোট চার সিটে বসার ব্যবস্থা। আমরা চারজন একই সারির চার চেয়ারে বসার যায়গা পেলাম। আমি এক জানালার পাশে আর ইঞ্জিনিয়ার আমার পাশে, সঞ্চালক অন্য পাশের আইল সিটে আর ক্যামেরাম্যান অপর পাশের জানালায়। বিমানবালা এসে সবার সিট বেল্ট বাঁধা হয়েছে কিনা নিশ্চিত করলো। যার বাঁধা হয়নি বা বাঁধতে অপারগ তারটা বেঁধে দিল। তারপর প্লেনের ইন্টারকম সাউন্ড সিস্টেমে ঘোষণা শুরু হল, এটা ওটা ইত্যাদি। সিট বেল্ট বাঁধা-খোলা দেখাচ্ছে। ব্যাস, শুরু হয়ে গেল ইঞ্জিনিয়ারের ভ্যাটের ভ্যাটের,

-ভাই দেখেন দেখেন; এই বিষয়টা আমি কিছুতেই বুঝি না; সিট বেল্ট বান্ধার পরে আবার সিট বেল্ট বান্ধা শিখায় ক্যান।

অপর পাশেই বসা সঞ্চালক, তিনি বললেন,

-যারা কিছুটা গর্দভের অধম তারা সিট বেল্ট লাগানোর পর খুলতে হয়তো পারবে না, সেই কারনেই দেখায়, সিট বেল্ট না লাগালে খোলা শেখাবে কি করে।

খোঁচাটার লক্ষ যে ইঞ্জিনিয়ার, সেটা তার বুঝতে অসুবিধা হয়নি হয়তো, সেই কারনে আশেপাশের এতো মানুষের মাঝে কথা না বাড়িয়ে চুপচাপ বসে রইলো। আমি ভাবলাম, যাক শান্তি। এবার অন্তত আধা ঘন্টা আর কিছু শুনতে হবে না। এই সময়টাকে কাজে লাগাই, ভাবনা গুলোকে গুছিয়ে নেই সামনের তিন দিনের আলোচনার বিষয় বস্তু দিয়ে। আমাদের বিমান আকাশে উড়েছে কি ওড়ে নাই, সময় কতক্ষণ গিয়েছে এসব বুঝে উঠবার আগেই ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমার চিন্তামগ্ন চেহারা দেখে আমাকে বিরক্ত করবার জন্যই হোক আর পাশের সিটে বসা সঞ্চালককে রাগাবার জন্যই হোক, আমাকে আস্তে করে ঠেলা দিয়ে জিপ্তোস করলেন,

-ভাই, আপনে কিছু বুঝছেন?

আমি বললাম, কি বুঝতে হবে আমাকে সেটা না বললে, আমি কি ভাবে বলবো আমি কি বুঝেছি আর কি বুঝি নাই।

ইঞ্জিনিয়ার আমার উত্তর পাবার আশা করেননি বোধহয়, যে কারণে খুশীর ছটা তার চেহারায় স্পষ্ট, বললেন,  
-এই যে ক্যামেরাম্যান সাহেবের থিয়োরী অব প্রবাবিলিটি; আমি ভাই এর আগে আরো দুইবার প্লেনে সিলেট গেছি; একবার বাবার লগে খুব ছোট বেলায়; তখন সিলেট-ঢাকা যাওয়া আসার পথে সমশের নগরের ছোট্ট একখান এয়ারপোর্টে যাত্রা বিরতি দিত; আমি যেই দিন বাবার সাথে গেলাম ঠিক তার পরের দিন সমশের নগরে প্ল্যান ক্র্যাশ কইরা সব যাত্রী মইরা গেল; এরপরে এই কয়েকদিন আগে সিলেট বিমানবন্দরে আমি যে প্লেনে ছিলাম সেইটার এক্সিডেন্ট; মানুষ মারা যায় নাই কিন্তু আহত হইছে অনেক; তাইলে ব্রেইনের থিওরী অব প্রবাবিলিটি অনুযায়ী এই যাত্রায় কি আমরা মরমু নাকি।

আমি হতবাক। কি বলবো বুঝতেই পারছি না। আমি বললাম,

-মানুষকে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করার শক্তি দেয়া হয়েছে, যাকে ইংরেজীতে বলে “ফ্রি উইল”; আপনার ভাবনা আপনার, আপনার কর্ম আপনার, আপনার ভবিষ্যৎ যাপিত জীবন সঠিক পথে রাখবার স্বার্থে আপনার কি করণীয় সে সম্পর্কিত একটা গাইড লাইন দেয়া আছে; এখন আপনার যদি এতই সিলেট যাত্রায় প্লেন ক্র্যাশে মারা যাবার ভয়, তাহলে আপনার নিজস্ব ফ্রি উইল ব্যবহার করলেই পারতেন, না আসলেই পারতেন।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

-আরে, তখন তো ক্যামেরাম্যান সাহেবে এইসব প্রবাবিলিটি মার্ক কখা কয় নাই, তাছাড়া এয়ারপোর্ট থেইক্কা তো ভাগতেই ছিলাম, এই সঞ্চালকই তো সুইচ টুইচ টিপাইয়া আটকাইলো; ঢাকা এয়ারপোর্ট থেইক্কা যদি এরপরেও ফেরত যাইতাম, তাইলে আগামী শনিবারে গর্দভের অধমের উপরে কিছু শুনাইয়া ছিল্লা কাইট্রা লবন লাগাইয়া দিত।

সঞ্চালক চোখ বন্ধ করে কিছু একটা ভাবছিলেন বোধহয়। সঞ্চালকের একটা গুন আছে, যতই ভাবনার মাঝে ডুবে থাকুক না কেন, আশেপাশের পৃথিবী থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন হন না। এখনও আমাদের কথপোকথন তার কানে ঠিকই লাগলো। চোখ বন্ধ করা অবস্থাতেই বললেন,

-ব্যটা মিস্ত্রী, এই বিমানে আমাদের অবস্থান কখনোই আমাদের শেষ অবস্থান না, এটা একটি মধ্যবর্তী অবস্থান মাত্র; মানুষের ফ্রি উইল বা স্বাধীন স্বপ্নার ঘোষনায় আমার বিশ্বাস আছে এবং যে মানুষ ফ্রি উইলে প্রাপ্ত স্বাধীনতা কে দেখিয়ে দেয়া সঠিক পথে ব্যয় করবে, সেটা মূল্যায়ন করে তাদের পরবর্তী অবস্থান নির্ধারণ করা হবে; সেই সূত্রে তুমি অবশ্যই একটি অসম্পূর্ণ সৃষ্টি যাকে সম্পূর্ণ করা হবে পরে; তোমারে ছিল্লা কাইট্রা লবন লাগানোর দিন এখনো শেষ হয় নাই।

ক্যামেরাম্যান চুপচাপ বসে জানালে দিয়ে বোধহয় মেঘের খেলা দেখছিলেন। এবার আমাদের দিকে ফিরে বললেন,  
-ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, আপনি আমার থিয়োরী অব প্রবাবিলিটিই এক্সেপ্ট করতে পারছেন না, অথচ সাইন্স আজ এমন পর্যায়ে পৌছে গিয়েছে যে, আগামী ২০৩০ সালের মাঝে একেবারে ভবিষ্যৎ বাণী করে আসবার মত টাইম মেশিন পাবে বলে আমি মনে করি।

আমি বললাম,

-সাইন্সের কোন ফ্যাক্টরের উপর নির্ভর করে আপনি এতবড় একটা কথা বলে ফেললেন। ক্যামেরাম্যান বললেন,  
-আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা “এআই” নিয়ে তো আমরা আগেই কথা বলেছি; নেটওয়ার্কিং থেকে শুরু করে আমাদের মোবাইল গুলো পর্যন্ত আজ এই টেকনোলজি ব্যবহার করছে; “এআই” এখন কোন পর্যায়ে চলে গিয়েছে সেটা আমাদের ভাবনাতেও আসবে না, তবে “এআই” এর পৃথক রূপের কমার্শিয়াল মার্কেটিং এখনো শুরু হয় নাই।

আমি বললাম,

-আপনিও কি আমার মত গুগুল আন্টির মাধ্যমে এইসব আজগুবি তথ্য পান নাকি; মনে রাখবেন, গুগুল আন্টি কিন্তু সবসময় সঠিক তথ্য দেয় না।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-সেটা তো পাইই তবে এটা অন্য ভাবে পেয়েছি; আমার এক ভাই উন্নত বিশ্বের এক সরকারি সাইন্টিফিক অর্গানাইজেশনে কাজ করে, দেশটার নাম বলছি না; তারা একটা ত্রিমাত্রিক টাইম মেশিন সিমুলেটর নিয়ে কাজ করছে, আবারও বলি সিমুলেটর, মূল যন্ত্র নিয়ে এখনো কাজ শুরুই হয়নি।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

-তারমানে প্লেন চালাইতে শিখাইবার সময় রুমের ভিতর বওয়াইয়া ভিডিও স্ক্রিনে যেভাবে প্লেন চালানি শিখায় সেই রকম রুমের ভিতর বইসা তারা ভিডিও গেমের টাইম মেশিন বানাচ্ছে।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-ঠিক তাই, যাই হোক, এই ভিডিও গেম ব্যবহার করে আপনি অতীত-ভবিষ্যত সব দেখে আসতে পারবেন; বাচ্চাদের ভিআর বা ভার্চুয়াল রিয়ালিটি গেমের চশমা যদি কখনো পড়ে থাকেন তবে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

-অহ, আপনি একেবারে পিওর ভিডিও গেমের কথা কইতেছেন।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-ঐ ধরনেরই একটা যন্ত্র; তবে এটার মাঝে "এআই" বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স টেকনোলজি ব্যবহার করে ভিডিও প্রোগ্রামটির এমন সক্ষমতা আনা হয়েছে যে, ভিডিও গেমটি ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী নিজেকে নিজেই বদলে নেয়; এই গেমের গ্রাফিকগুলো বর্তমানে বাজারজাত ভিডিও গেমসের গ্রাফিক্সের চেয়ে প্রায় একশো গুণ উন্নত; পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্ত যত আবিষ্কার হয়েছে সব গুলো আবিষ্কারকে তারা সেই প্রোগ্রামে ঢোকাবার চেষ্টা করেছে; সেই আবিষ্কার গুলো মানব সভ্যতায় কতদিনের মাঝে কি পরিবর্তন এনেছে সেটাও ঢুকিয়েছে তারা প্রোগ্রামে; দেখা গেল, সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার গুলো অনেক কম সময়ে মানব সভ্যতায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসছে।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

-কি কইতেছেন কিছুই বুঝতেছি না।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-একটা উদাহরণ দিলে হয়তো বুঝবেন, নিউটনের মধ্যাকর্ষণ সূত্র মানব সভ্যতায় যত তাড়াতাড়ি পরিবর্তন এনেছে, তারচেয়ে অনেক কম সময়ে অনেক বেশি পরিবর্তন এনেছে আইনস্টাইনের থিয়োরী অব রিলেটিভিটি; আর গত পঞ্চাশ বছরে সাইন্স তো অবিশ্বাস্য গতিতে এগিয়ে চলেছে; এই গতিটাকে কম্পিউটারে নিয়ে তারা ভবিষ্যতের পৃথিবীকে সাজিয়েছে; তারপর গত হাজার বছরের ইতিহাসকে রিকনস্ট্রাক্ট করেছে; এরপর তারা শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাইকোলজি, সোসাল সাইন্স, দর্শন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বর্তমানের নামকরা ব্যক্তিদের সেই সিমুলেশনে বসিয়ে অতীত থেকে ঘুড়িয়ে এনে তাদের রেইন ডিটেকশনের মাধ্যমে সরাসরি কম্পিউট করেছে সেই ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা গুলোকে, সেই অভিজ্ঞতার আলোকে ভিডিও গেমসটির আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স তার অতীত এবং ভবিষ্যত গ্রাফিক্স এবং তথ্য গুলো পরিবর্তন করতে থাকে সারাক্ষণ।

সঞ্চালক এবারে মুখ খুললেন,

-আপনি কি নিজে ব্যবহার করেছেন যন্ত্রটা।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-আমার ভাই হার্ড ড্রাইভে করে সেই প্রোগ্রামের মূল সিমুলেটরের অংশ এবং তাদের তৈরী একটি ইম্প্রুভড ভিআর মেশিন নিয়ে এসেছিল আমাদের উপমহাদেশীয় অভিজ্ঞতা গুলোকে কম্পিউট করার জন্য, যন্ত্রটি এখনো ঢাকায় আছে; সিলেট থেকে ফিরে আপনারা যদি আসেন বাসায় তাহলে চোখে লাগিয়ে দেখে নেবেন, টাস্কি খেয়ে যাবেন; আমি গতরাত্রে এই ভিডিও গেম দিয়ে অদূর আগামীতে, মানে ভবিষ্যতে গিয়েছিলাম; চোখ থেকে ভিআর খোলার পর কোন কারণে আমার মন খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

-মন খারাপ কইরেন না, ঘোড়া কেনার আগে লাগাম কিনা বসলে লাগাম কোন কামে দেয় না; প্লেন চালানি শিখার ঐ সব ত্রিমাত্রিক সিমুলেটর যেমন জীবনেও আকাশে উড়ে না তেমনি আপনার ঐসব টাইম মেশিন সিমুলেটরও জীবনেও সত্যিকারের ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারবেনা।

ঠিক এই সময়েই বিমান বাবার অদ্ভুত উচ্চারণে সুমিষ্ট কর্তৃস্বর ভেসে এল প্লেনের সাউন্ড সিস্টেমে। গতানুগতিক ঘোষণা, আমরা আর অল্প কিছুক্ষনের মাঝেই অবতরণ করতে যাচ্ছি সিলেট ওসমানি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে, বাইরের তাপমাত্রা, স্থানীয় সময় ইত্যাদি। মনযোগ থাকে না বলেই হয় তো ঘোষণার শেষ দিকের কথাগুলো আগে কখনো খেয়াল করিনি অথবা বিমানবালা আজ ভুল করেই হয়তো শেষের দিকে বললেন,

-ক্যাপ্টেন ও তার ফুদের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, আপনাদের সিলেট ভ্রমণ সুন্দর হোক, আল্লাহ হাফেজ।

সাথে সাথে ইঞ্জিনিয়ার বেশ জোড়ে বলে উঠলো,

-দেখছেন দেখছেন, কইছি না আজকে আমাগো কপালে খারাবী আছে; দেখেন দেখেন কি কইলো; ক্যাপ্টেন আর ফুরা বিদায় নিছে, আমাগো শুভ কামনাও করছে; ব্যাটারা ভাগতেছে ভাই, ঠেকান।

এবার আর শুধু সঞ্চালক বা আমরা না, আশেপাশের মানুষ জনও বোধহয় বিরক্ত হল, সকলে মাথা ঘুড়িয়ে তাকালো আমাদের দিকে। সঞ্চালক মুচকী হেসে তাদের কে বললেন,

-ভাইরা, এই লোকটারে যদি আপনারা মারতে চান, প্লেন থেকে নেমে শুরু করে দিয়োন, যদিও আমরা তার বন্ধু কিন্তু আপনারা আমাদের সহযোগীতা পাবেন; সারাক্ষণ স্বালাইয়া মারে আমাদের তার ফালতু প্যাঁচাল দিয়ে।

## অবশেষে সিলেটে

নাহ, কোন দুর্ঘটনা ছাড়াই আমরা নামলাম সিলেট এয়ারপোর্ট। নাহ, কেউ ইঞ্জিনিয়ার কে মারার জন্য এগিয়ে আসেনি, আমাদেরও তাদের সহযোগীতা দিতে হয়নি। বিমানবন্দর থেকে বের হয়েই দেখি আমাদের ক্যামেরাম্যানের নাম বড় একটা কাগজে প্ল্যাকার্ড মার্কা লেখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার এলাকা সম্পর্কিত ভাতিজা “মুক্তি”। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত সময়ে তার জন্ম। তার বাবা-মা খুব শখ করে নাম রেখেছিল মুক্তি, পরে এই নামটি হয়ে দাঁড়ায় তার অহংকার। তার পুরো নাম এলাকায় কেউ জানে কিনা আমার সন্দেহ আছে। খুব মজার এক ছেলে। তাকে আমি মুক্তি ভাতিজা বলেই ডাকি। ক্যামেরাম্যান তার দিকে এগিয়ে যেয়ে বললেন,

-তুমিই মুক্তি।

সে হ্যাঁ সূচক মাথা ঝাঁকালো। ক্যামেরাম্যান আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন,

-মুক্তি আমাদের আগামী তিন দিনের গাইড কাম সফর সঙ্গী; যারা আমাদের গাড়িটা আগামী তিন দিনের জন্য দিয়েছে সেই কোম্পানীতে চাকরী করে।

আমি মুক্তির দিকে তাকিয়ে বললাম,

-এতোদিনে জানলামনি যে তুমি মৌলভীবাজারে চাকরী কর।

মুক্তি সাথে সাথে বলল,

-না কাকা, আমার পোস্টিং সিলেটে, আপনে আকমল ভাইয়েরে বলেন নাই যে আপনে আসবেন।

আমি বললাম,

-ওইচ্ছে করেই জানাইনি; ওদের জানালে খামাঙ্কা এয়ারপোর্টে ভিড় করবে, তাছাড়া কাল তো আমি যাচ্ছিই এলাকাতে, সেটা ওরা জানে।

মুক্তি বললো,

-আমি ফোন দেই আকমল ভাইরে; তারা সব সিলেট শহরে আছে; আপনার সাথে আমার দেখা হইছে অথচ তাদের জানাই নাই শুনলে আমার সাথে রাগ দেখাবে।

আমি কিছু বলার আগেই সঞ্চালক বললেন,

-এখান থেকে মৌলভীবাজারে আমাদের ঠিকানায় যেতে কত সময় লাগতে পারে।

আমি বললাম,

-ঘন্টা দুয়েক লাগবে।

সঞ্চালক বললেন,

-বেলা তো প্রায় তিনটা; তারমানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে প্রায় পাঁচটা; সকাল থেকে তো পেটে তেমন কিছু পরেনি; চলেন সিলেটে কোথায়ও বসে কিছু খেয়ে নেই; মুক্তিও সকলকে ফোন দিয়ে জানিয়ে দিক আমরা কোথায় বসবো; তারা যদি আসতে চায় চলে আসলো সেখানে; আমাদেরও পেট ঠান্ডা, মুক্তিরও আর বকাবাজি শুনতে হল না।

আমি দেখলাম আইডিয়ারটা ভাল। সঞ্চালকের কথায় হঠাৎ ফ্রিধের জ্বালাটাও পেটের ভিতরে যেন আওয়াজ তুলে জানান দেয়া শুরু করেছে। মুক্তিকে বললাম,

-আকমলকে জানিয়ে দাও আমরা "সাম্পান" রেস্টুরেন্টে আগামী ঘন্টা খানেক আছি; সে এবং আর যারা সিলেট আছে তারা চাইলে ওখানে চলে আসতে পারে।

গাড়িতে উঠার আগেই মুক্তি তিন চারটা ফোন দিয়ে ফেললো, তার কাজ শেষ। আমরা রওনা হলাম সিলেটের দিকে। আমি বললাম,

-সিলেট আসছেন, "সাম্পান" যাবার পথে হযরত শাহ জালালের মাজারটা যেয়ারত করে যাই, "সাম্পান" থেকে বেড়িয়ে হযরত শাহ পরানের মাজার যেয়ারত করে বাইপাস দিয়ে মৌলভীবাজার চলে যাবো।

কেউই না বললেন না। আমিও শুরু করলাম মুক্তির পরিচয় পর্ব,

-দারুন এক সফর সঙ্গী পেয়েছেন; এই ছেলের গুনের শেষ নাই; কথা প্রায় বলেই না, কাজ করে বেশী; লেখা পড়া কতদূর করেছে কখনো জিজ্ঞেস করিনি কিন্তু পিএইচডি যে একখান আছে অদ্ভুত কথা বলার সেটা আমি নিশ্চিত; তার মাস্টার্সও আছে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার; আমার এলাকায় আমার সিলেট ভাষা শুনানকে পরিশালিত করার

জন্য আমার সাথে সকলকে অঞ্চলিক ভাষায় কথা বলার আমি নির্দেশ দিয়ে রেখেছি; একমাত্র আমার এই ভাতিজাকে নির্দেশ দেয়া আছে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার জন্য; তার শুদ্ধ ভাষার বক্তৃতা শুনলে আপনি মজাই পাইবেন, কথা দিতাম পারি; আর ম্যাট্রিক পাস করা আছে কুসংস্কারে।

মুখ খুললো মুক্তি,

-নাহ কাকা, আমি শুধু দাদা পরদাদাদের শিথিয়ে যাওয়া কিছু বিষয় পালন করার চেষ্টা করি; আমার দাদা পরদাদাদের তো দেখেন নাই, আমার দাদা শনিবারে কখনো বাড়ি থেকে বেশী দূরে যেতেন না; আমার বাবাও সেটা মানতেন, আমিও মানি।

সঞ্চালক বললেন,

-বাবা মুক্তি, তুমি যখন ভাইয়ের ভাতিজা তখন আমারও ভাতিজা; তুমি শনিবারের যে নিয়ম পালন করার কথা বললে, ওটাই গোড়ামী; ধর্ম মানা এক বিষয় আর বাবা-দাদা করেছে বলে ধর্মের সাথে সম্পর্কহীন অযৌক্তিক আচরণ পালন করা আরেক বিষয়।

## মৌলভীবাজার

সিলেটে খুব বেশী সময় লাগলো না। আকমল সহ আমার এলাকার জনা বিশেক নেতা কর্মীদের নিয়ে হালকা কিছু খাওয়া আর পরিচয় পর্ব, মাজার যেয়ারত শেষে মৌলভীবাজার রওনা হতে হতে প্রায় চারটা বেজে গেল। শীতের বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা যে কখন হয় সেই হিসেব আমি আজও করতে পারিনা। কুয়াশা চিড়ে আলো আঁধারীর খেলা দেখতে দেখতে চলে এলাম মৌলভীবাজারের চা বাগান এলাকায়। কুয়াশা কাহাকে বলে যদি দেখতে হয় তবে অবশ্যই মৌলভীবাজারের এই চা বাগান এলাকায় আসতে হবে। ঋণে দেখা যাবে রাস্তার কিনারে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে জমাট বাঁধা কুয়াশা, কিছুক্ষণ পরেই কোন সময় যে উঁচুতে উঠে গিয়েছি বুঝে উঠবার আগেই সেই ঘন কুয়াশা ঘিরে ধরে। সামনের পাঁচ হাত দূরের আলোটাও পর্যন্ত দেখা যায় না।

ছয়টার মাঝেই চলে এলাম সঞ্চালকের ব্যবস্থাপনায় আগামী দুই রাত্রী যাপনের জন্য নির্ধারিত আমাদের চা বাগানে। চা বাগানের সরু এবং প্যাঁচ খাওয়া, কুয়াশায় ঢাকা, প্রায় অন্ধকার রাস্তায় বাড়ি কেটে যখন সত্যিকারের আলোর দেখা পেলাম, তখন বুঝলাম এটাই আমাদের থাকবার যায়গা। কুয়াশার চাদরে ঢাকা বাংলোটোর সামনে গাড়ি বারান্দায় এসে পৌঁছাবার পরও বাংলোটা থেকে আসা আলোর ক্ষমতাতেই কুলাচ্ছে না আমাদের গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাতে। পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে ঠিক ভৌতিক বলা যাবে না তবে রহস্যময় বলা যেতে পারে। আসলে যৌক্তিক ব্যাখ্যা এবং জানার পরিধি কমে গেলেই আমার কাছে সব কিছুই রহস্যময় লাগে। আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটি হল দৃষ্টিশক্তি, সেটার সীমা এই বাগানে এখন সর্বোচ্চ পাঁচ ফুট, শ্রবণ নামক ইন্দ্রিয় তো রীতিমত পীড়া দেয়। চারিদিকে কোন শব্দ নেই, মাঝে মাঝে শুধু শেয়ালের ডাক ছাড়া। আড্ডা জমবে ভাল।

গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথে হাসি হাসি মুখে “স্বাগতম স্বাগতম” বলতে বলতে এগিয়ে এলেন চা বাগানের ম্যানেজার সাহেব। পরিচয় পর্ব শেষ হতে হতেই বুঝে নিলাম ভদ্রলোক কথা বলতে খুব পছন্দ করেন, খুব অমায়ীক এবং সজ্জন ব্যক্তি। তিনি বললেন,

-আমি ভাই আপনাদের সেবায় খুব কম আসতে পারবো; আমি কালই চলে যাবো সিলেট; যদি রাতে ফিরি দেখা হবে; পরশু তো আপনাদের ক্লাইট বিকেল চারটায়; পরশু দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে বেলা একটার দিকে রওনা হলেই হবে; তখন আমাকে অবশ্যই পাবেন।

আমাদের কোন কথা বলার সুযোগ দিতেই রাজি নন ম্যানেজার সাহেব, এক নাগাড়ে কথা বলেই চলেছেন,

-আপনাদের খাবার ব্যবস্থা এখানে কিন্তু থাকার ব্যবস্থা করেছি এখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরেই পাশাপাশি চারটি ছোট ছোট টিলার ওপর আমাদের চারটি বাংলো আছে, সেই বাংলো গুলোতে; বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে কুড়ে ঘর কিন্তু আসলে ইট-কঙ্কিটের উপর ছন দেয়া, সবই আধুনিক; আমাদের বাংলো এলাকার সব পথই পায়ে হাঁটার

পথ, গাড়ির ব্যবহার এই বাংলা পর্যন্তই; আপনারা ইচ্ছে করলে চারটি বাংলাই ব্যবহার করতে পারেন, আবার ইচ্ছে করলে একেকটিতে দু'জন করেও থাকতে পারেন।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সাথে সাথে বললেন,

-আমরা দুইটাই ব্যবহার করুম।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কি ভুতের ভয়ে একা থাকতে চাচ্ছেন না।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

-ভুতের ভয় না থাকলেও স্ত্রীনের ভয় তো আছেই কিন্তু চাইর দিকে যেই রকম শিয়ালের ডাক শুনতেছি, আর কি কি আছে বুঝতেছি না তো।

সঞ্চালক বললেন,

-দুইজন একসাথে থাকলে কি শেয়াল বা অন্য জন্তু জানোয়ার বা স্ত্রীন আসবে না নাকি।

আমি ভেবেছিলাম ম্যানেজার সাহেবের কথা বোধহয় শেষ হয়েছে কিন্তু সে আশায় গুড়ে বালি দিয়ে তিনি বললেন, -আরে না না ভাই, শেয়াল ছাড়া আর কিছুই পাবেন না এখানে; আমরা মানুষেরা বড়ই ভয়ংকর প্রাণী; একটা গল্প শোনাই, সোনার গহনা তৈরী হয় তো লোহার হাতুরি দিয়ে সোনা পিটিয়েই, আবার লোহা পিটিয়েও তৈরী হয় বিভিন্ন অস্ত্র আর তৈজস পত্র; তো একবার সোনা লোহাকে জিঞ্জের করলো, ভাই লোহা, আমাদের দু'জনকে তো পিটিয়েই বিভিন্ন জিনিস তৈরী করা হয়; যখন আমাকে পিটায় তখন আমি কোন শব্দ করি না কিন্তু তোমাকে পিটালে তুমি এতো শব্দ কর কেন? লোহা বললো, ভাইরে, নিজের জাত যখন নিজের জাতকে পিটায় তখন মনে বড় ঘা লাগে, তাই চিৎকার করি; হা হা হা হা, এখন বুঝলেন তো, মানুষে মানুষে পিটাপিটিতে পুরো সভ্যতারই নাভিস্বাস উঠে গিয়েছে, অন্য প্রজাতির কোন আশাই নেই এই পৃথিবীতে।

ক্যামেরাম্যান এতোই উত্তেজিত যে নিজের অজান্তেই টেবিলে ছোট্ট একটা থাপ্পর দিয়ে বললেন,

-এইখানেই তো কথা; মানুষের কর্মকাণ্ডে যে গ্রীন হাউজ ইফেক্ট দেখা দিয়েছে, সেটাতে তো মনে হয় না মহা প্লাবনের জন্য আমাদের খুব বেশী দিন আর অপেক্ষা করতে হবে।

সঞ্চালক বললেন,

-সেটার কারণ কি শুধু কার্বন নিস্বরণ বলতে চাইছেন।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-নাহ, সেটা কেন হবে; ম্যানেজার সাহেবের কথাতেই আসি, জীব বৈচিত্র্য আমরা ধ্বংস করে ফেলছি; যেমন, সুন্দরবনের বনজীবিদের কথাই ধরি; তাদের মাঝে যারা মধু আহরনকারী তারা কিন্তু জানে যে, তাদের মধু আহরণ করেই জীবন ধারণ করতে হবে; তারা যখন মৌচাক ভাঙ্গে তখন মৌমাছির চাক থেকে শুধু মধুর অংশটুকুই ভেঙ্গে নেয়; রানী মৌমাছির অংশটিকে ডিস্টার্ব করেনা; যে কারণে কিছুদিনের মাঝেই আবার পূর্ণাঙ্গ মৌচাক গড়ে ওঠে; একইভাবে যারা সুন্দরবনে গোলপাতা আহরণ করে জীবিকা নির্বাহ করে, তারাও গোলপাতার দুইপাশের অংশটিকে কাটেনা, যে কারণে কিছুদিনের মাঝেই আবার গোলপাতা গড়ে ওঠে; কিন্তু বাইরের মানুষেরা যখন সুন্দরবনে যেয়ে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা শুরু করলো তখন তৈরী হল সমস্যা; প্রথমত, তারা বনের চরিত্র সম্পর্কে কোন ধারণাই রাখে না, দ্বিতীয়ত, তারা মনে করে এই জীবিকায় না পোষালে অন্য জীবিকা বেছে নেবে; তারা মধু আহরণের সময় মৌচাকের জড় শুদ্ধ কেটে আনে, গোলপাতা কাটার সময় এক কোপে পুরো গাছটাই কেটে ফেলে; বাস, প্রকৃতিই শেষ।

আমি বললাম,

-আপনার কথাগুলো কিন্তু রাজনীতিতেও খাটে, রাজনীতির সাথে সম্পর্কহীন মানুষ গুলো রাজনীতিতে এসে রাজনীতিকে জড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলার বন্দোবস্ত করছে; যাক, আপনি যা বললেন তার সব তো প্রাকৃতিক ইকো সিস্টেমের কথা বললেন, এর সাথে কার্বন নিস্বরণ বা গ্রীন হাউজ ইফেক্টের সম্পর্ক কি, জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক কি?

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-মানুষ কিভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে সেটার উদাহরণ এটা, সব মিলিয়েই গ্রীন হাইজ ইফেক্ট এবং সে কারণে তৈরী হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা, ঘটছে জলবায়ুর পরিবর্তন; যেমন, বিভিন্ন যায়গায় আমরা বাঁধ দিয়ে বিদ্যুত উৎপাদনের জন্য যে বিশাল জলাশয় তৈরী করছি বা পানির গতি প্রকৃতি পরিবর্তন করে বহুমান স্রোতের মাঝে যে স্থবিরতা তৈরী করছি এবং সে কারণে যে মিথেন গ্যাস তৈরী করছি, সেটাতেও গ্রীন হাউজ ইফেক্ট ত্বরান্বিত হচ্ছে অবশ্যই।

সঞ্চালক বললেন,

-আপনি কি জানেন, মানব সৃষ্ট বাঁধের কারণে বা পানির মানব সৃষ্ট গতি প্রকৃতি পরিবর্তনের কারণে যে মিথেন গ্যাস তৈরী হয় তারচেয়ে বহুগুন বেশী গ্যাস তৈরী হয় প্রাকৃতিক জলাশয় গুলোতে।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-সেটা হচ্ছে কিন্তু আমরা তো প্রাকৃতিক নিয়মের নিরাময় শক্তির জন্য বোঝার ওপর শাকের আঁঠি হলেও তৈরী করছি।

সঞ্চালক বললেন,

-আমি আপনার সাথে একমত নই; বোঝার ওপর শাকের আঁঠির তুলনায় যদি মানুষের উপকার বেশী হয়, তবে আমি উপকারের পক্ষে; আমার কথা হল, প্রাকৃতিক নিয়মেই জলবায়ু পরিবর্তিত হচ্ছে, মহেনজাদারো, ইনকা সভ্যতা, মায়্যা সভ্যতা, এমনকি আমাদের ময়নামতি সভ্যতাকে দেখে মানুষ আজ বিস্মিত হয়, ঐ সময়েই পয়ঃনিষ্কাশন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ থেকে শুরু করে তারা বর্তমানের আধুনিক নগর সুবিধাদির ব্যবস্থা করেছিল; সাগরের নীচেও এধরনের আধুনিক অথচ প্রাচীন সভ্যতার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে; তাদের সভ্যতাও ধ্বংস হয়ে শত ফুট মাটির নীচে বা পানির নীচে চলে গিয়েছে বিভিন্ন সময়ের জলবায়ু পরিবর্তনে সৃষ্ট প্লাবনের কারণেই; তখন জনসংখ্যা ছিল কম, সভ্যতা গুলোও গড়ে উঠেছিল খুব স্থানীয় ভিত্তিতে; আমাদের বর্তমান বৈশ্বিক সভ্যতার ব্যাপ্তির কারণে, অতীতের মত একই ধরনের প্লাবন কখনোই পুরো মানব সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিতে পারবে না; হয়তো কিছু অংশ বিলীন হয়ে যাবে।

ক্যামেরাম্যান খুব আহত হয়ে বললেন,

-তারমানে বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে যে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে আপনি সেটার পক্ষে?

সঞ্চালক ফোরন কেটে বললেন,

-আমার মত মানুষের পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়ায় তো আর পৃথিবীর সভ্যতায় কোন পরিবর্তন নিয়ে আসবে না; তবে আপনাদের মত প্রকৃতি ভক্ত মানুষেরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে এতো চিৎকার করেন কিন্তু একটা কথা ভুলে যান যে, প্রাকৃতিক নিয়মের দশ থেকে বারো হাজার বছরের একটা চক্র আছে; প্রতি দশ থেকে বারো হাজার বছর পরপর একবার করে পৃথিবীর ম্যাগনেটিক পোল বা চৌম্বকীয় মেরুর পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ, উত্তর মেরু হয়ে যায় দক্ষিণ মেরু, দক্ষিণ মেরু হয়ে যায় উত্তর মেরু; পৃথিবীর এই মেরু পরিবর্তনের কারণেও আবহাওয়ার পরিবর্তন হয় এবং ফলশ্রুতিতে পৃথিবীতে বরফ যুগ, মহাপ্লাবনে একটা ভূমিকা রাখে; এই মেরু পরিবর্তনকেই ধরে নিতে পারেন পৃথিবীর প্রাকৃতিক নিরাময় ব্যবস্থা; আমি মনে করি বর্তমানে আমরা সেই মেরু পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি; দশ-বারো হাজার বছরের চক্রের সেই পরিবর্তনটি কবে আসবে সেটা একটি বৈজ্ঞানিক তর্কের বিষয়; হতে পারে আগামী বছরও আবার হতে পারে একশো বছর পরে; যখনই সেটা আসুক, খুব কাছাকাছি সময়ে মহাপ্লাবন আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে সেটা নিশ্চিত; লক্ষ লক্ষ বছরের পৃথিবীর ইতিহাসে পঞ্চাশ একশো বছরের মানব সৃষ্ট সামান্য ভুলকে আপনি বা আপনার মত প্রকৃতিবাদিরা যে ভাবে গুরুত্ব দেন, সেটাকে আমি পুরোপুরি গ্রহন করতে পারি না; আমাকে আপনিই বলেন শেষ বরফ যুগ কখন এসেছিল?

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-ধরে নিন বিশ বাইশ হাজার বছর আগে।

সঞ্চালক বললেন,



-দেখেন, আপনি কিন্তু এখানে নিশ্চিত না, হিসেবের মাঝে দুই হাজার বছরের একটা ফাঁক রাখলেন; এখন আমাকে বলেন আইস এজের বা বরফ যুগের সমাপ্তি কবে নাগাদ হয়েছিল।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-সেটাও এগারো বারো হাজার বছর আগে।

সঞ্চালক বললেন,

-তাহলে আমাকে বলুন, তখনকার মানুষেরা তো কার্বন নিঃস্বরণ বা গ্রীন হাউজ ইফেক্ট তৈরী করার মত কোন নির্বোধ কান্ড ঘটায়নি, তাহলে কেন আইস এজ শেষ হয়ে বন্যা হয়েছিল; যাক, আমরা বোধহয় ম্যানেজার সাহেবের বিষয়টা থেকে দূরে সরে যাচ্ছি।

ম্যানেজার সাহেব ভ্যাভাচ্যাকা খেয়ে বললেন,

-আমি আবার কি করলাম।

সঞ্চালক বললেন,

-না, আপনি কিছু করেন নাই; মানুষের কারণে সভ্যতার ধ্বংস হবার বিষয়ে আমি এবার একটা গল্প শোনাই; অষ্টেলিয়ায় বিশাল এক জঙ্গলের একেবারে মাঝখানে একটা কাগজ তৈরীর কারখানা করা হল, যার প্রতিদিন পাঁচশো টন গাছ প্রয়োজন; মানুষ বুদ্ধিমান, তারা বুঝলো বন যতই বড় হোক না কেন, এই বন থেকে প্রতিদিন পাঁচশো টন গাছের সরবারহ করা বেশী দিন সম্ভব না; তারা প্রায় তিন হাজার হেক্টর জমিতে এমন এক প্রজাতির গাছ দিয়ে বনায়ন করলো, যে গাছ গুলো বছর চারেকের মাঝেই কাগজ তৈরীর জন্য যথেষ্ট বড় হয়; এক সময় কাগজের কারখানার জন্য তাদের আশেপাশের প্রাকৃতিক বন শেষ করে তাদের নিজস্ব বনায়নের উপর স্বনির্ভর একটি কাগজ উৎপাদনের কারখানা তৈরী হল; আপত দৃষ্টিতে মনে হল, প্রাকৃতিক বন উজার হলেও আগের তুলনায় অনেক বড় নতুন বন তৈরী করায়, তারা প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করেনি; এক সময় কিন্তু বোঝা গেল, তারা প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলেছে; আমাকে বলেন কেন?

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-সহজ বিষয়; আগে ঐ বনে পনেরো বিশ প্রজাতির গাছ ছিল, সে কারণে ঐ সব গাছের উপর নির্ভরশীল বিভিন্ন ধরনের কীট পতঙ্গ, পশু পাখিরও সমারহ ছিল; একই ধরনের গাছ থাকায় সেই ভারসাম্য বিলিন হতে বাধ্য; হিসেবটা আমার কাছে খুব সহজ; মানুষ তার অতীতের ভুল গুলো বুঝে, এই মুহূর্তে যদি সেই ভুল সংশোধন করার পদক্ষেপ না নেয়, তবে মানব প্রজাতির জন্য ভবিষ্যৎ বলে কোন কাল থাকবে না।

সঞ্চালক বললেন,

-ভাইরে, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব এক সূত্রেয় গাঁথা, যদি আপনি ফোর্থ ডাইমেনশন যুক্ত করেন তবে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হবে,

সব পথ এসে

মিলে গেল শেষে।

আমি বললাম,

-আপনি আজকে দিনের মধ্যে কোন কারণ বা ব্যাখ্যা ছাড়া এইবার নিয়ে দ্বিতীয়বার ফোর্থ ডাইমেনশনের কথা বললেন।

সঞ্চালক বললেন,

-আজ রাতে এই বিষয়ে আলাপ হবে, এখন বরং ম্যানেজার সাহেবের সাথে আমাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট আলাপ সেরে নেই।

ম্যানেজার সাহেব এতক্ষণ চুপ করে থাকার পাত্র নন সেটা আগেই বুঝেছি, উনি সুযোগ খুঁজছিলেন আলোচনায় যোগ দেয়ার জন্য, এটাকে মোক্ষম সুযোগ ধরে নিয়ে সময় নষ্ট না করে বললেন,

-আমাদের বাগানেও জলবায়ু পরিবর্তনের আলামত পাচ্ছি, আমরা আমাদের চা বাগানের কিছু অংশে রাবার চাষ করেছি; রাবার গাছ আসলে অদ্বুত; তারা অক্সিজেন ছাড়ে না বললেই চলে; যে কারণে ঐ বাগানের গাছের নীচে

কোন কিছু জন্মায় না; ঐ গাছের নীচে আপনি বেশীক্ষণ বসলে বুক ভারী হয়ে আসবে; কিন্তু আমার সমস্যা অন্যখানে; রাবার বাগানের মাঝখানে বিশাল এক খোলা যায়গা, আর খোলা যায়গার একদিকে বিরাটকায় এক দীঘি আছে, দীঘির ওপাশে আছে আরেকটি ছোট্ট চা বাগান; স্থানীয় লোকেরা ঐ দীঘিটাকে জ্বীনের দীঘি বলে ডাকা শুরু করেছে, কারণ, স্থানীয় মানুষজন ওখানে মাঝে মাঝেই মিষ্টি একটা গন্ধ পায় এবং অনেকেই গুতান হারায়; সকলে বলে ওখানে জ্বীন আছে; আপনারা একবার যেয়ে দেখবেন কি বিষয়টার কোন কূল কিনারা করতে পারেন কিনা; আমার লোকজন ওদিকে যেতেই চায় না ভয়ে, যে কারণে আমার রাবার চাষে বেশ অসুবিধা হচ্ছে।

ইঞ্জিনিয়ার বলে উঠলেন,

-আমি ঐ সব জ্বীন ভুতের তদন্তে যাইতে রাজি না।

ম্যানেজার একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন, বললেন,

-আমি আপনাদের গাছ গাছালি সম্পর্কে আগ্রহ দেখে কথাটা বলেছি, যাবার কোন প্রয়োজন নেই; তবে একটা স্পট বটে ওটা; ওখানে না গেলে একটা সুন্দর যায়গা দেখা থেকে বঞ্চিত হবেন।

সঞ্চালক বললেন,

-আরে ম্যানেজার সাহেব, আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার সময় ওকে ইঞ্জিনিয়ার বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছি, আসলে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব কুসংস্কারে ভরা একজন ভাল মানুষ, যে কারণে ওকে মিস্ট্রী বলি আমি; যাবো না মানে, অবশ্যই যাবো; আজকে রাতের আড্ডা ঐ স্পটেই হবে; মিস্ট্রী যদি না যায় শেয়াল নেকড়ের সাথে বাংলাতে একা ঘুমাতে না হয়; আমাদের বলেন শুধু কি ভাবে যাবো।

ম্যানেজার বললেন,

-ওহ, আপনাদের সাথে তো পরিচয় করিয়ে দেইনি; উনি হলেন আমাদের বাগানের এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, নীরু; তার মোবাইল নাম্বারটা রেখে দিন, যে কোন প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে নীরুর সাথে যোগাযোগ করলেই হবে; সে আপনাদের জন্য ২৪ ঘন্টা স্ট্যান্ডবাই থাকবে আগামী দুদিন; তাকে বললেই স্পটে নিয়ে যাবে; আর আপনারা সকালে দুপুরে রাত্রে যাই খেতে চান, আগের দিন আমাদের বাগানের বহু পুরনো মানুষ এই নিবারন কে জানিয়ে রাখবেন, সে সব ব্যবস্থা করে দেবে।

আমি বললাম,

-ম্যানেজার সাহেব, আমরা এখানে নির্ঝঞ্ঝাট গল্প করার জন্য এসেছি, থাকা খাওয়া নিয়ে বেশি দুশ্চিন্তা করবেন না।

ম্যানেজার সাহেব বললেন,

-গল্প করেন, খান, আবার গল্প করেন; আমাদের বাগানের মালিক নানকা সাহেব আপনাদের জন্য সারাদিন অপেক্ষা করে আপনারা আসবার কিছুক্ষণ আগে চলে গেলেন; উনি খুব ভোজন রসিক এবং মেহমানদারি করতে খুব পছন্দ করেন; আজ আপনাদের বহুবার ফোনে চেষ্টা করেছেন, আপনাদের মোবাইলে পাচ্ছিলেন না; কাল যদি আপনাদের আপত্তি না থাকে তবে দুপুরে একসাথে খাবেন বলে জানিয়েছেন।

সঞ্চালক বললেন,

-নানকা ভাইকে নিয়ে এই এক ঝামেলা; উনি অতি বেশী অমাইক; ওনার বাগানে আমাদের যায়গা দিয়েছেন সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ; এখন যদি আমাদের আরও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করতে চান সেটায় আমরা আপত্তি করবো কেন।

ম্যানেজার সাহেব বললেন,

-নানকা সাহেবকে আপনি চেনেন কি করে।

সঞ্চালক বললেন,

-দীঘির ঐ পাশের যে ছোট্ট চা বাগানের কথা বললেন, সেটা আমার ঘনিষ্ঠ একজন আত্মীয়ের; সেই সূত্রে মাঝে মাঝেই দেখা হয়।

ইঞ্জিনিয়ার বলে উঠলেন,

-আপনার আল্লীয়েচর চা বাগান ফেলাইয়া এইখানে উঠলেন ক্যান।

সঞ্চালক বললেন,

-ওটা কাল নানকা সাহেব আসলে কিছুটা বুঝবেন হয়তো, আর বাকিটা বুঝতে হলে আমার আল্লীয়েচর চা বাগানে যেতে হবে; আমার আল্লীয়েচর ছোট্ট একটি বাগান করেছেন, ওখানে না আছে ভাল থাকার বন্দোবস্ত আর না আছে ফ্যাক্টরী; চা বাগান দেখতে চাইলে নানকা ভাইয়ের অতিথি হবার বিকল্প অত্র অঞ্চলে নেই; উনি এখানকার স্থানীয় আদি বাসিন্দাই শুধু নন, এখানের ইউনিয়ন পরিষদের সাতবারের চেয়ারম্যান।

ম্যানেজার বললেন,

-একটু ভুল বললেন, এই ইউনিয়নের সাতবারের চেয়ারম্যান নন উনি, এখন উনি অন্য ইউনিয়নের চেয়ারম্যান; উনি একই ইউনিয়ন থেকে দ্বিতীয়বার নির্বাচন করেন না; এই উপজেলায় মোট আট ইউনিয়ন, সাতটা ইউনিয়ন থেকে চেয়ারম্যান হয়ে গিয়েছেন; আগামীবার বাকি একটা ইউনিয়ন থেকে ইলেকশন করতে পারলে ওনার কোর্স কম্পলিট।

আমি হতবাক। বললাম,

-বলেন কি, এতো জনপ্রিয়, তাহলে আর কিছু না হোক, উপজেলা চেয়ারম্যান হতে তো পারতেন।

ম্যানেজার সাহেব বললেন,

-নাহ, উনি কোন রাজনৈতিক ঝামেলায় যেতে চান না; এমনিতে খুব নির্বিজ্ঞাট সৌখিন মানুষ; শুধুই মানুষের উপকার করবার জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইলেকশন করেন।

সঞ্চালক বললেন,

-সেটা জানি কিন্তু নানকা সাহেবের সাথে তো আমার কথা হয়েছে গতকালও; আমাদেরকে যে ফোনে পাওয়া যাবে না সেটা তো উনি জানেন।

ম্যানেজার বললেন,

-কেন কেন, সিলেট, মৌলভীবাজারে তো মোবাইল নেটওয়ার্ক খুব ভাল।

সঞ্চালক বললেন,

-আমরা আসলেই কিছু নির্বিজ্ঞাট গল্প করার জন্য এসেছি; মোবাইল আমরা প্লেনে উঠেই যে বন্ধ করেছি সেটা আবার খুলবো ঢাকা যাবার প্লেনে উঠেই।

ম্যানেজার বললেন,

-আপনাদের কথার ধরনেই বুঝেছি যে, আপনাদের আড্ডা খুব জমানো আড্ডা হবে; কাল ফিরতে খুব বেশী রাত না হলে আপনাদের আড্ডায় যোগ দেবো, যদি অনুমতি দেন।

সঞ্চালক বললেন,

-আমাদের কোন রাত বিরাত নেই, চলে আসবেন।

এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নীরু বললেন,

-স্যার, রাত কিন্তু আটটা বাজে প্রায়; আপনারা বাংলাতে যেয়ে ফ্রেশ হয়ে এসে থাকেন, নাকি একবারে খেয়ে বাংলাতে যাবেন; রাতের খাবার টেবিলেই আছে।

নীরু এমন ভাবে কথাটা বললেন, যেটাকে রাতের খাবার খেয়ে একবারে থাকার যায়গায় যাবার অনুরোধ বলেই মনে হলো। সকলেই কথার ধরন বুঝেই বোধহয় আগে খেতে রাজি হল। খেতে বসলাম সকলেই। রাজবাড়িতে খাওয়ার কোন অভিজ্ঞতা আমার নেই, তবে সাধারণত আমি রাতের খাবার হিসেবে যা খাই তার দর্শগুন বললেও কম বলা হয়ে যাবে দেখে শব্দটা ব্যবহার করলাম, “রাজসিক” আয়োজন। খেতে খেতে সিদ্ধান্ত হল, আমরা তিনটি বাংলা ব্যবহার করবো। আমরা চারজন দুটো বাংলাতে, মুক্তি একটিতে। খাওয়া শেষ হতেই ম্যানেজার সাহেব বললেন,

-চা বাগানে এসেছেন, এক কাপ বাগানের ফ্রেশ চা খেয়ে তারপর যান।

সকলেই রাজি। চা খেতে খেতে সঞ্চালক বললেন,

-ম্যানেজার সাহেব, যে যায়গায় স্ত্রী আছে বলে সবাই মনে করে, সেটা কি রাবার বাগানের মাঝখানে নাকি অন্য যায়গায়।

ম্যানেজার সাহেব ইঞ্জিনিয়ারের দিকে একঝলক দেখে নিলেন। ওনার হাবভাবে যা বুঝলাম, উনি চান আমরা স্ত্রীনের দীঘি যাই কিন্তু মনে ভয়, ইঞ্জিনিয়ার না আবার বাগড়া দিয়ে বসেন; সেই ভয় নিয়েই উনি বললেন,

-স্ত্রী টিন কিছু নেই, কুসংস্কারাঙ্কন স্থানীয়রা ওটাকে স্ত্রীনের দীঘি বলে; দীঘির ওপারেই একটা তারকাটার বেড়া, তারপরই তো আপনার আল্লিয়ার চা বাগানের টিলা শুরু, বাকি তিন দিকেই আমাদের রাবার বাগান; ওখানে যাবার রাস্তা আমাদের রাবার বাগানের ভেতর দিয়েই, বাগানের মাঝখানে একটা বিশাল দীঘি, খুব সুন্দর যায়গা, নীল পদ্ম, বিভিন্ন রঙের শাপলা, দেখলে মন জুড়িয়ে যাবে।

সঞ্চালক বললেন,

-স্ত্রীনের দীঘির আপনাদের পার এখান থেকে কতদূর।

নীরু বললেন,

-এক কিলোমিটারের বেশী হবে না, তবে হেঁটে যেতে হবে।

সঞ্চালক বললেন,

-রাতেই তাহলে যাবো ওখানে, সারা রাত স্ত্রীনের দীঘির পারেই আড্ডা হোক।

ম্যানেজার অবাক কর্তে বললেন,

-বলেন কি, এই ঠান্ডার মাঝে জমে যাবেন তো; বাইরে কেমন ঠান্ডা বুঝতে পারছেন না।

আমি বললাম,

-আমাদের প্রিপারেশন আছে; মুখ ঢাকা টুপি থেকে শুরু করে গরম কাপড় অন্দি।

ম্যানেজার বললেন,

-তারপরও, এই শীতে এক ঘন্টাও খোলা যায়গায় টিকতে পারবেন না; যদি একান্তই রাতে যেতে চান তাহলে আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-আপনি যেভাবে বাধা দিচ্ছেন সেটাতে আমার যাবার ইচ্ছে বেড়ে গেল; আমরা যাচ্ছি; যাওয়া আসায় সর্বোচ্চ দুই কিলোমিটারের রাস্তাই তো, সমস্যা হলে চলে আসবো।

ম্যানেজার সাহেব নীরুকে সব বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন। নীরু একটি টর্চ হাতে আমাদের নিয়ে চললেন আমাদের আগামী দুদিনের বাসস্থানের দিকে।

## কুহেলিকা

চারিদিকে অন্ধকার কুয়াশা। আসলে ঢাকায় বসে কুয়াশা দেখার সৌভাগ্য অনেকেরই হয় না। মেইন বাংলা থেকে যাবার জন্য কংক্রিটের সুন্দর স্ল্যাব বিছানো রাস্তার দু'পাশে দশ গজ দূরে দূরে ল্যাম্প পোস্ট আছে কিন্তু কুয়াশার জন্য ল্যাম্প পোস্টের আলো রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছে না। ওপরে আলোর দিকে তাকিয়ে খুঁজে নিতে হয় আলো কে। আমাদের দু'হাত সামনেই নীরু টর্চ হাতে পথ দেখিয়ে নিচ্ছেন, মাঝে মাঝে টর্চের আলো পেছনে ফেলায় আমরা রাস্তার অবয়ব খানা দেখছি। নীরুর ছায়ার মত কায়াকে অনুসরণ করতে করতে আমাদের প্রথম বাংলাতে পৌঁছালাম। সিদ্ধান্ত হল, এখানে থাকবেন সঞ্চালক আর ক্যামেরাম্যান। এই বাংলা থেকে অল্প একটু ঢাল বেয়ে নেমে গজ বিশেক দূরে আরেকটি টিলার উপরের বাংলাতে যায়গা পেলাম আমি আর ইঞ্জিনিয়ার। আর সেখান থেকে ৩০/৪০ গজ দূরে আরেকটি টিলায় ভাতিজা মুক্তি। ফ্রেশ হবার কিছুই নেই। আধা ঘন্টার মাঝেই আড্ডাবাজদের ছোট্ট দলটি রওনা হল, উদ্দেশ্য, স্ত্রীনের দীঘি।

কেন রাতে স্ত্রীনের দীঘি যেতে ম্যানেজার সাহেব নিষেধ করেছিলেন সেটা রওনা হবার পাঁচ মিনিটের মাঝেই হাড়ে হাড়ে বুঝলাম। আহা হঠাৎ। ভাগ্যিস নীরুর পিড়াপিড়িতে বাংলো থেকে সবাই কন্ডল নিয়ে এসেছিলেন। মাথা এবং মুখ টুপিতে ঢাকা আমরা সবাই, তার সাথে শরীরে মোট চার প্রস্থ কাপড়, তার উপর কন্ডল চড়িয়েও ঠান্ডা মনে হচ্ছে হাড়ের মাঝে ঢুকে শরীরে একটা কাঁপুনি ধরিয়ে দিচ্ছে। সবাই কেন যে ঠান্ডার কথা উঠলেই শুধু রংপুর, দিনাজপুরের কথা বলে বুঝলাম না। শ্রীমঙ্গলের ঠান্ডার অভিজ্ঞতা আমার আগেও ছিল কিন্তু আজকের অভিজ্ঞতার কাছে আগের অভিজ্ঞতা পরাজিত।

জুবুখুব হয়ে প্রায় গায়ে গায়ে লেগে ছয়জনের একটা দল চলছি। মুক্তিকে খুব অনুরোধ করেছিল ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আমাদের সাথে স্ত্রীনের দীঘি না যাবার জন্য। তার ইচ্ছে ছিল, মুক্তি আর সে থেকে যাবে। আমিও বলেছিলাম মুক্তি কে থেকে যাবার জন্য, কারণ, আগামীকাল সকাল আটটার মাঝে যেহেতু আমি এলাকায় চলে যাবো আর সে যেহেতু আমার সাথে এলাকায় যেতে চাইছে, সুতরাং, আমাদের সাথে তার দীঘির পারে না যাওয়া ভাল। মুক্তির উত্তর,  
-কাকা, আপনাদের গল্প শুনতে খুব মজা পাচ্ছি, আপনি যদি সারারাত জেগে থেকে কাল সকাল আটটায় যেতে পারেন আমিও পারবো।

সুতরাং, ইঞ্জিনিয়ারের উপায় রইলো না আমাদের সাথে যাওয়া ছাড়া। সে সারা রাস্তা স্ত্রীনের ভয়েই হোক আর ঠান্ডা কমাবার ইচ্ছেতেই হোক, একেবারে আমার গায়ের সাথে গা লাগিয়ে বিড়বিড় করে মূলত সঞ্চালকের শাপশাপান্ত করতে করতে বলে চলেছে,  
-ব্যাডা নিজে একখান পাগল, আরও কয়েক খানে পাগল বানাচ্ছে, মাঝখানে আমি সাধারণ একখান মানুষ, আমাকে ধ্বংস করার বন্দোবস্ত।

ইঞ্জিনিয়ার আরও কিছু প্রকাশ যোগ্য নয় ধরনের ভাষা প্রয়োগ করে আমাদের সাথে চলেছে। সঞ্চালক কোন উত্তর দিচ্ছেন না, তার চেহারার অভিব্যক্তিও বুঝবার কোন উপায় নেই, একে তো মুখ সকলের ঢাকা, তার উপর কুয়াশার কারণে দুই হাত দূরের জিনিষও বেশ অস্পষ্ট। ইঞ্জিনিয়ার ছাড়া আর সকলেরই মুখে কোন শব্দ নেই। নিঃস্বাস রাতে দাঁতে দাঁতে ঠকঠাকানির একটা শব্দ পাচ্ছি কিন্তু সেটার উৎস খুঁজে বের করা সম্ভব নয়, খুব সম্ভবত ক্যামেরাম্যানের। এক সময় নীরু চারদিকে টর্চের আলো ঘুড়িয়ে বললেন,  
-স্যার, আমরা এখন রাবার বাগানের একদম মাঝখানে আছি; একটু খেয়াল করে দেখেন, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।  
আমি বললাম,  
-কিসের কষ্ট, ঠান্ডার কষ্টের কাছে আর সব কষ্ট তুচ্ছ।  
ইঞ্জিনিয়ার বললেন,  
-এতক্ষণে আমার দলে আইতেছেন।

আরো মিনিট পাঁচেক চলার পর হঠাৎ ইঞ্জিনিয়ার ফিশফিশ করে বললেন,  
-সামনে কি স্ত্রীন নি ঐ গুলা।  
মাথা তুলে তাকিয়ে দেখি আমাদের কাছ থেকে গজ পাঁচেক সামনে একটা অগ্নি কুন্ডলী ঘিড়ে কয়েকটি ছায়া। একটু যে বুকুর ভেতর ধুক করে ওঠেনি তা নয়। কিন্তু নীরু না থামায় আমাদেরও থামার কোন সুযোগ নেই। এরপর নীরু যেন ঘোষণা দিলেন,  
-আমরা চলে এসেছি স্ত্রীনের দীঘি।  
ঘোষণা শোনার সাথে সাথেই ইঞ্জিনিয়ার পারলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো,  
-কইছিলাম না ঐ গুলা স্ত্রীন, এইবার সব শ্যাষ।

## স্ত্রীনের দীঘি

কিসের স্বীন, আগুনের কাছে গিয়ে বুঝলাম ওটা আমাদের বাবুঁটি নিবারন, সাথে আরও জনাকয়েক মানুষ। কিন্তু দীঘি কোথায়। নীরু জানালো, দীঘি শুরু হয়েছে আগুন থেকে দশ গজের মত সামনে। দীঘি লম্বায় প্রায় হাজার গজ, চওড়ায় প্রায় ছয়শো গজ। ঘন কুয়াশা আর নিকশ কালো অন্ধকারের মাঝে দীঘি দেখার কোন উপায়ই নেই।

যতটুকু বুঝতে পারলাম, এই একঘন্টার মধ্যেই নিবারন আর তার লোকজন বিশাল কর্মসাধন করে ফেলেছে। দুই থাকে লাকড়ি সাজিয়ে তিন চার ফুট উঁচু গোল মত করে আগুন জ্বালিয়েছে দীঘির দিকে মুখ করে। চারপাশে চারটে বাঁশের খুঁটি এবং মাঝে একটা খুঁটি দিয়ে লম্বায় চওড়ায় প্রায় দশ হাতের একটা তেরপলের সামিয়ানা টাঙ্গিয়েছে। আগুনটা জ্বালিয়েছে সামিয়ানার সামনের দিকে ডান কোনে, আগুন থেকে একটু দুরেই সারারাত আগুন জ্বালিয়ে রাখবার জন্য আরো কিছু শুকনো ডাল পালা জড়ো করে রাখা। তেরপলের নীচে আগুনের সামনে ছয় সাতটা প্লাস্টিকের চেয়ার, চেয়ার গুলোর পাশে দু'টো প্লাস্টিকের টেবিল। টেবিলের উপরে রয়েছে একটি চার্জার লাইট, অনেকগুলো বিস্কুটের প্যাকেট, বেশ কয়েকটি কাপ আর আমার জন্মে দেখিনি এমন ঢাউশ সাইজের দু'টা ক্লাস্ক। চেয়ার গুলোর পেছনে মনে হল খড় আর শুকনো পাতার স্তুপের ওপর আরেকটি তেরপলের বিছানা, ইচ্ছে করলেই আরামে ঘুম দেয়া যাবে।

নীরু বললেন,

-ওবা নিবারন, তুমার লুকজনের কাইল ছুটি, আমরা দুই একখান গান শুনাইয়া তারা যদি বাড়িত যাইতো চায় যাইতো ফারে।

আমি বললাম,

-আমার অবা ক লাগছে, এতো বড় আয়োজন নিবারন এতো তাড়াতাড়ি করলো কিভাবে।

নীরু বললেন,

-ওরা আমাদের চা বাগানেরই শ্রমিক, তাদের থাকার ব্যবস্থা আমাদের রাবার বাগানের ওপারে একটা ছোট বাজারের পাশে; আজকাল মোবাইলের যুগ, মোবাইলে নিবারন বলে দিয়েছে ওদের কি করতে হবে; নিবারন শুধু চা বানিয়ে নিয়ে এসেছে; স্যার আগেই বলেছেন, আপনারা দুধ চিনি ছাড়া কফি খেতে পছন্দ করেন, তাই এক ক্লাস্কে দুধ চিনি ছাড়া চা এবং আরেক ক্লাস্কে শুধু গরম পানি; কফি কেনাই ছিল; কফি খেতে ইচ্ছে করলে বানিয়ে খেয়ে নেয়া যাবে, আর যদি পানি খেতে চান তাহলে শুধু পানি কাপে ঢেলে নিয়ে পাঁচ মিনিট পর খেলেই পেয়ে যাবেন ঠান্ডা পানি।

কিছুক্ষণ পর আগুনের একপাশে নিবারনেরা বসে করুন অথচ অদ্ভুত এক মন উদাস করা সুর ধরলো। নিবারনের সেই করুন সুরের টান প্রায় মিনিট খানেক চললো, তারপরেই একটা বাঁশের টুকরোর সাথে আরেকটি বাঁশের টুকরো দিয়ে এক রহস্যময় ঠক ঠক আওয়াজের তাল ধরলো আরেকজন, সাথে গম্ভীর কণ্ঠে নীচু স্বরে এক গুঞ্জন ধ্বনি তুললো সকলে মিলে। সেই গুঞ্জন এমনই গা ছমছমে হিম শীতল যে, আগুনের তাপ মনে হল বরফ হয়ে গিয়েছে। ঐ গুঞ্জনের মাঝ খানে খুব উঁচু স্বরে অপরিস্রিত এক ভাষায় নিবারন গান শুরু করলো। ভাষা কিছুই আমার বোধগম্য নয় কিন্তু কেন যেন কথা গুলো বুঝতে কোন অসুবিধাই হল না। গান চলছে তো চলছেই, আমরাও শুধু নিস্তব্ধ নয়, নিশ্চল হয়ে শুনে চলেছি।

গানটি কখন শেষ হয়েছে আমরা কেউ বুঝিনি। কানের কাছে যেন গান শেষ হবার পরও গানের সুর ঘুড়ে বেড়াচ্ছে।

সম্বন্ধি ফিরে এলো নীরুর কথায়,

-আপনারা চা খাবেন কি?

সঞ্চালক নীরুর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন,

-এটা কোন ভাষায় গান গাইলো ওরা।

নীরু বললেন,

-এরা সাওতাল; সাওতালি ভাষার গান শুনলেন; তাদের মনের চাপা দুঃখ গুলোর কথা এই গানে বলা হয়েছে।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-সেটা বুঝেছি; আমি চা শ্রমিক সম্পর্কে আর তাদের দুঃখ ভরা জীবন সম্পর্কে কিছু জানি।

নীরু বললেন,

-এখন কিন্তু তাদের সেই অবস্থা নেই; এখন তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, তাদের অনেক ছেলে মেয়ে শিক্ষা পর্ব শেষ করে এখানেও চাকরী করছে, অনেকে বাইরে গিয়ে চাকরী করছে, চা শ্রমিকদের বেতনও এখন অনেক; তবে নিবারনের মত বয়স্ক পুরুষ গুলোর অনেকের মাঝেই পুরনো কিছু বাজে স্বভাব রয়ে গিয়েছে।

শীত আর জ্বীনের ভয়ে কাবু ইঞ্জিনিয়ার কম্বল মুড়ি দিয়ে ক্যামেরাম্যানের গায়ের সাথে গা লাগিয়ে বসে ছিলেন। এতক্ষণে মুখ খুললেন,

-পুরানো স্বভাব মানে খিতাবা।

ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে এক জ্বালায় পরেছি। সে সিলেটি ভাষা বলতে “ক” কে “খ” বলা বোঝে আর কথার শেষে “বা” লাগানো বোঝে। নীরু বললেন,

-কাল ওদের পাড়ায় কি একটা উৎসব আছে, যদি ওদের সম্পর্কে জানতে চান, আগামীকাল রাতে চলেন ওদের গ্রামে, ওদের নাচ, গান সবই দেখে আসবেন না হয়।

নীরুর কথা এড়িয়ে আমি নাড়ির টানে বললাম,

-ওরা শাহ আব্দুল করিম গাইতে পারে না।

উত্তর নিবারন দিল,

-বাবু, আমরা সিলেটি মাতউত হখল পারি, শাহ আব্দুল করিমের গান তো আমরা খুব শখের গান, শুনতায়নি।

আমি সম্মতি দিতেই আগে তাল ধরলো সেই বাঁশের টুকরো দুটো দিয়ে, তারপর শুরু হল নিবারনের শাহ আব্দুল করিম।

“ভব সাগরে নাইয়া

মিছা গৌরব করোরে পরার ধন লইয়া

একদিন যাইতে হবে এই সমস্ত খুইয়া রে...।”

শাহ আব্দুল করিমের গান শুনলেই আমার মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। ওনার গানের কথা গুলো শুধু আমার হৃদয়ে দাগ কাটে তা নয়, তাঁর সাথে আমাদের পরিবারের এক দীর্ঘ ইতিহাস আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি ব্যক্তিগত ভাবে শাহ আব্দুল করিমকে শুধু চিনতামই না, খুবই সুসম্পর্ক ছিল আমার সাথে। তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে একবার দেখা হয়েছিল, আমাকে দেখেই শব্দহীন আনন্দের জল তাঁর দু'চোখ বেয়ে আঝোড় ধারায় ঝরে পরলো।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে মূল নেতৃত্বকারী অংশের নেতা হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি তখন আমার বাবার। এর মাঝেই এলো ১৯৫৪ সালের সংসদ নির্বাচন। এই নির্বাচনে বাবা যুক্তফ্রন্টের নৌকা মার্কা নিয়ে জগন্নাথপুর-দিরাই আসনের প্রার্থী। নির্বাচনী প্রচারণায় দিরাইয়ের শাহ আব্দুল করিম ছিলেন বাবার নিত্য সঙ্গী। বাবার মুখে শুনেছি সেই সময়ের নানান গল্প। তখনকার মানুষ আজকের মত এতো রাজনৈতিক সচেতন ছিলেন না। জনসভা গুলোতে মানুষ যেতে চাইতো না। মাইক টাইকের প্রচলন ছিল না। টিনের চোঙ্গা ফুঁকেই চলতো সব। বাবার কোন জনসভা থাকলে শাহ আব্দুল করিম আগে যেয়ে গান গেয়ে আর তাঁর কথার যাদুতে মানুষকে সম্মোহিত করে আসর জমাতেন। তারপর বাবা বক্তব্য দিতেন, ঐ টিনের চোঙ্গা ফুঁকেই।

১৯৯৭ সালের কথা বোধহয়, ঢাকার রমনা পার্কে তখন বাউল উৎসব সবে শুরু হয়েছে। আমিও গিয়েছি সেখানে। আমারও ভাগ্য ভাল, দু'য়েকজন পরেই গান গাইতে উঠলেন শাহ আব্দুল করিম। প্রায় ১০/১২ বছর পর

দেখলাম তাঁকে। গান শেষে মঞ্চার পেছনে যেয়ে তাঁকে আমার পরিচয় দিতেই বুক জড়িয়ে ধরে বহু কথা। উনি বাবার কথা জিজ্ঞেস করতেই বললাম,  
-বাসায় চলে আসেন আগামীকাল সকাল আটটায়।  
শাহ আব্দুল করিম বললেন,  
-আমি তো বাসা চিনি না।  
আমি বললাম,  
-কোথায় উঠেছেন বলেন, আমি যেয়ে নিয়ে আসবো।  
উনি সন্মতি দিলেন।

রাতে বাবাকে শুধু বললাম,  
-আপনি কাল সকাল আটটার দিকে বাসায় আছেন কিনা।

বাবা বললেন আছেন। ব্যাস, শাহ আব্দুল করিমের কথা আর বললাম না। পরের দিন শাহ আব্দুল করিমকে নিয়ে বাসায় হাজির। বাবাকে যেয়ে বলতেই সব ফেলে বাবা ড্রইং রুমে এলেন। বাবাকে দেখেই শাহ আব্দুল করিমের মুখ ঝিলিক দিয়ে উঠলো, বললেন,  
-কিতাবা চুঙ্গা ফুকা রাজনীতিবিদ, বালানি।

বাবাও খুব আন্তরিকতা নিয়ে তাকে বুক জড়িয়ে ধরে থাকলেন অনেফন। তাদের এই দৃশ্য দেখে আমি রুম থেকে সরে পরলাম। এরপর দুইজনে মিলে ঘন্টা খানেক কি গল্প করলেন জানি না। আমার আর তাকে নামিয়েও দিতে হয়নি। বাবাই তাকে নামিয়ে দিয়ে আসলেন, নিজে।

নিবারন কয়টা গান গাইলো বুঝতেই পারলাম না। ঠান্ডা, কুয়াশা, পারিপার্শ্বিকতা কিছুই মনে রইলো না। পারিপার্শ্বিক জগতে ফিরলাম নিবারনের কথাতেই,  
-বাবু চা।  
দেখি নিবারন একেবারে আমার পাশে একটা চায়ের কাপ নিয়ে দাঁড়িয়ে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে পরলাম, এক হাতে চা নিতে নিতে নিবারনকে আরেক হাতে কাছে টেনে নিয়ে বললাম,  
-কাল যদি তোমাদের উৎসবে যাই, তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না তো।

নিবারন উত্তর দেবার আগেই তার সঙ্গের ছয় জন একসাথে হাউ মাউ করে কিছু বলা শুরু করলো। কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না তারা খুশী হয়েছে আমার যাবার কথা শুনে, নাকি যেতে নিষেধ করছে। নিবারন একেবারে আমার পায়ের কাছে বসে কান্না কান্না কর্তে যা বললো বলে বুঝলাম,  
-“কুহারে যাইছোরে বাবু”।

অবশেষে নীরু হাত তুলে তাদের থামিয়ে আমাকে বললেন,  
-আপনার কথায় তারা কিছুটা মনে আঘাত পেয়েছে; তারা বিশ্বসই করতে পারছে না আপনারা তাদের বাড়িতে যাবেন; তাদের বাড়িতে আপনারা গেলে তারা খুশীতে মারাই যাবে হয় তো।

ওরে বাবা, মারা গেলে তো আর যাওয়া যাবে না। নীরু ওদেরকে বললেন,  
-ওনারা তো যাবেনই, সাথে নানকা সাহেবও থাকতে পারেন।

৩

কিংকর্তব্যবিমূঢ় শব্দটি আজকাল কথ্য বাংলায় খুব একটা প্রচলিত নয়, কিন্তু নিবারনের দলের সেই মুহূর্তের অবস্থা দেখে ঐ শব্দটির কথাই প্রথমে মনে আসলো। নিবারন একসময় বললো,  
-বাবু আমরা তাইলে যাইগি, কিছু ব্যবস্থা করি কালকের।



নীরুও অনুমতি দিলেন তাদের যাবার। তাদের এই মুহুর্তে বাইরের কেউ দেখলে বুঝতেই পারবে না যে তাদের কোন দুঃখ কষ্ট আছে। মনে হবে যেন, তাদের চেয়ে সুখী মানুষ আর পৃথিবীতে নেই, কাল আমরা যাচ্ছি তাদের বাড়ি। চলে গেল নিবারন ও তার দল।

নিবারনেরা গিয়েছে কি যায় নাই, ইঞ্জিনিয়ার ফিসফিস করে বলে উঠলো,  
-বুঝতেছেন কিছু।

আমি বসেছিলাম ক্যামেরাম্যানের পাশের চেয়ারে। আমি বললাম,  
-এই একটা আপনার বাজে স্বভাব; কি বুঝতে চাইছেন না বললে বুঝবো কি করে।  
ইঞ্জিনিয়ার বললেন,  
-স্বীন স্বীন, স্বীনের গন্ধ।

আমি জোড়ে নিশ্বাস টেনে বুঝলাম আমাদের সামনে রাখা কাঠপোড়া আগুনের গন্ধ ছাপিয়ে আসলেই একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে আসছে। ব্যাপারটা আমার কাছেও ভাল লাগলো না। গাঁ ছমছম করে উঠলো। সঞ্চালক ইঞ্জিনিয়ারের কথা শুনেছেন বলে তার অভিব্যক্তিতে বোঝা গেল না, আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন,  
-বাতাস আসছে দীঘির দিক থেকে; দীঘির ওপারে তো আমার আল্লীয়ের বাগান, তাই না।  
নীরু বললেন,  
-ঠিক তা না; দীঘির ওপারে তারকাটার বেড়া দিয়ে দুটো বাগানের সীমানা নির্ধারণ করা আছে, তারপর দুই সারি ছোট ছোট ন্যাড়া টিলা, তারপর শুরু হয়েছে আপনার আল্লীয়ের বাগান।

সঞ্চালক বললেন,  
-দীঘির সব পারেই কি আপনাদের লোক জন যেতে ভয় পায়।  
নীরু বললেন,  
-নাহ, শুধু দীঘির বাম দিকে যেতে ভয় পায় তারা; কেউ কখনো ওখানে যেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে বলে শুনি নি, তবে অনেকেই ওদিকে কাজ করতে যেয়ে ঘোরে ধরা মানুষের মত ফিরে এসেছে।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন,  
-আমার তলপেটে চাপ বাড়তেছে, ছোট খাটো কামের প্রেশার।  
ক্যামেরাম্যান বললেন,  
-এতো বড় প্রকৃতির মাঝে বসে আছেন, প্রকৃতির ডাকে সারা দিতে প্রকৃতির কোলেই চলে যান।

ইঞ্জিনিয়ার পারলে জড়িয়ে ধরে ক্যামেরাম্যানকে,  
-ভাইরে, আমারে এখনো স্বীনে ধরে নাই, কোনদিক থাইকা ধরবো বুঝমু কেমনে।  
মুক্তি বললো,  
-কাকা, আমার সাথে আসেন, স্বীন ভূত আমারে ড়ায়, কিছু বলবে না।

মুক্তি চার্জারটা হাতে নিতেই খুব সাবধানে কুঁজো হয়ে উঠে দাঁড়ালেন ইঞ্জিনিয়ার, তারপর কুঁজো হয়েই আস্তে আস্তে পা ফেলে চললেন নিরাজের পিছু পিছু। তাকে দেখে মনে হল, সোজা হয়ে দাঁড়ালেও তার কাজ হয়ে যেতে পারে।  
ক্যামেরাম্যান বললেন,  
-ভদ্রলোক যে এতো ভীতু আগে বুঝিনি, একেবারে আমার সাথে লেগে বসেছিল এতক্ষণ।  
সঞ্চালক খুব মনোযোগ দিয়ে কুয়াশার ঘেরাটোপের মাঝে দীঘিকে খুঁজতে খুঁজতে বললেন,  
-নীরু সাহেব, আমার ধারণা আমি আপনাদের সমস্যাটা বুঝতে পেরেছি; এই মিষ্টি গন্ধটার সাথে আমার পরিচয় আছে।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-আপনি কি পপি ফুলের কথা বলছেন? আমার একবার পপি ফুলের গন্ধ নেবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়েছিল, এই গন্ধটা ওরকমই লাগছে।

সঞ্চালক বললেন,

-ঠিক ধরেছেন, আমার ধারণা, আমার আঞ্জীয়ের বাগানের দিকের সেই নেড়া দুই টিলার কোথায়ও জংলী পপি ফুলের একটা ঝোপ আছে।

সঞ্চালক নীরু সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললেন,

-কাল ঐ বাগানের ম্যানেজার সাহেবকে লাঞ্চে আসতে বলেন, নয়তো সকালে আমার সাথে আপনার মোবাইল থেকে আলাপ করিয়ে দিলে আমি বুঝিয়ে বলে দেবো, আগামীকালই আপনাদের স্বীন সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করছি।

আমি বললাম,

-আহা, আপনি তো আমার আশার আঙুনে ছ্যাঁত শব্দে পানি ঢেলে দিলেন, স্বীনের সাথে দেখা হবে বলে আর মনে হচ্ছে না।

এরই মধ্যে মুক্তি আর ইঞ্জিনিয়ার ফিরে এসেছে, ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

-এইসব স্বীন টিনের কথা আর কইয়েন না তো, এইবার তো ছোট কামের উপর দিয়া গেছে, এরপরে পেটে মোচড় খাইলে ঝামেলা।

আমি বললাম,

-এতো ভয় পাবার কি আছে, আমরা এতো জন আঙুনের সামনে বসে আছি।

ইঞ্জিনিয়ার রীতিমত ভেঙ্গটী কেটে বললো,

-আঙুনের সামনে বসে আছি, আরে স্বীনও তো আঙুনের তৈরী।

আমি বললাম,

-আর মানুষের জীবনের মৌলিক অংশ কিন্তু স্বীনের আঙুনের বিশুদ্ধ অংশ “আলো”। থাক, ঠিক আছে, স্বীন বিষয়ক আলাপ আমরা করবো না, তারচেয়ে আমরা বরং ইবলিশ বিষয়ক আলাপটা সেরে ফেলি।

ইঞ্জিনিয়ার প্রলাপ বকা শুরু করলেন,

-নো নো, ইবলিশ স্বীনের কোন আলাপ না, পারলে আপনাদের ঐ সব তত্ত্ব কথা কইতে পারেন, নাইলে চলেন ঘুমাইতে যাইগা।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, জীবনে কোনদিন এরকম আয়োজন আপনি পেয়েছেন কিনা জানি না, আমি সেই ছোট বেলায় স্কুলে পড়ার সময় ক্যাম্পিং করতে যেতাম, তখন এর কাছাকাছি অভিজ্ঞতা পেয়েছি; তারপরও সেই অভিজ্ঞতা এর তুলনায় দশ ভাগের এক ভাগ; ভবিষ্যতে এরকম পরিবেশ আর নাও পেতে পারেন ধরে নিয়ে সময়টাকে উপভোগ করার চেষ্টা করেন।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

-আমার দিকে ভাল মত তাকাইয়া কন তো দেখি চেহারার কোন যায়গায় এখন ভোগ বা উপভোগের কথা লেখা আছে।

সঞ্চালক আমাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন,

-থাক, ইবলিশ নিয়ে এখন কথা না; তাছাড়া ইবলিশ নিয়ে কথা বলার আগে তো মাল্টিভার্স, ফোর্থ ডাইমেনশন, পরিবর্তনশীল এটম নিয়ে কথা বলতে হবে, আর এসবের আগে আলাপ করতে হবে ক্যামেরাম্যানের বলা সেই ভিডিও গেমের ভূত-ভবিষ্যতের কথা।

ইঞ্জিনিয়ার বোধহয় এবার কেঁদেই ফেলবেন, বললেন,

-ও ভাইয়েরা, ভবিষ্যতের লগে আবার ভূত লাগান কেন, আমরা কি মাইরা ফেলাইবার ষড়যন্ত্র করতাম।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-আপনি সারাঞ্চণ খালি ষড়যন্ত্র তত্ত্ব খুঁজে বেড়ান কেন বলেন তো।

সঞ্চালক বললেন,

-ঠিক আছে বাদ, সব বাদ, আসেন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নিয়েই কথা বলি।

আমি বললাম, ভাই, বলেন ষড়যন্ত্রের কথা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারকে প্রয়োজনে ঘুমের ওষুধ খাওয়াইয়া হইলেও বাকি বিষয় গুলো নিয়েও আলাপ করতে হবে, স্যাটারডে ক্লাবের প্যাঁচাইলা পরিবেশে ঐ আলাপের এরকম সুযোগ আর পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

মুক্তি আস্তে করে বললো,

-কাকা, আমার কাছে কিন্তু ঘুমের ওষুধ "ডরমিকাম" আছে, দেবো নাকি।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

-দেখছেন দেখছেন, আপনারা ভাতিজাটারেও নষ্ট করতেছেন, আমার পিছনে লগাইতেছেন; দাও দাও, তোমার ঘুমের ওষুধ দাও, আমিও শান্তি, এরাও শান্তি।

মুক্তি পকেট থেকে বের করে একটা কি ওষুধ ইঞ্জিনিয়ারের হাতে ধরিয়ে দিল বুঝলাম না, ওটা খাওয়ার প্রায় সাথে সাথেই ইঞ্জিনিয়ার ঘুম।

আমি মুক্তিকে বললাম,

-ভাতিজা, তুমি ডরমিকামের মত ঘুমের ওষুধ পকেটে নিয়া ঘুড়িয়া বেরাও কেনে।

মুক্তি বললো,

-না কাকা, ঐটা মাথা ব্যাথার ওষুধ "এইস"।

আমি বললাম,

-মাথা ব্যাথার ওষুধ খেয়ে এই ভাবে ঘুমায় কেউ।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-শোনে, ওষুধের গুণে মানুষের রোগের নিরাময় হয় খুব কম; মূল হল ওষুধের ওপর মানুষের বিশ্বাস।

সঞ্চালক বললেন,

-অন্য কারো ক্ষেত্রে ওষুধের ওপর বিশ্বাসের বিষয়টা খাটে কিনা জানি না, তবে মিস্ট্রীর অবস্থা দেখে বলতে পারি বিষয়টি প্রমানিত সত্য।

আমি বললাম,

-ভাই, ইঞ্জিনিয়ার গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, শুরু করেন।

সঞ্চালক শুরু করলেন,

-ক্যামেরাম্যানের মতই আমি বিশ্বাস করি যে, আগামী দশ বছরের মাঝে বিশ্বে এক বিরাট পরিবর্তন আসবে; টাইম মেশিনে করে মানুষ হয়তো অতীত-ভবিষ্যত ঘুড়ে বেড়াতে পারবেনা এই দশ বছরের মধ্যে কিন্তু যেহেতু আলোর কনা ফোটন কে মানুষ ক্যামেরায় ধরার ব্যবস্থা করে ফেলেছে, সুতরাং, মাইক্রো মিনিয়েচার ক্যামেরা দিয়ে ভবিষ্যতের ছবি যে তুলে আনতে পারবে সেটাকে আমি আঙ্গিক, অর্থাৎ, আমাদের এই আঙ্গার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু প্রমান করার মত তত্ত্ব আপনাদের শোনাতে পারি।

আমি বললাম,

-বলেন কি, তাইলে তো টাইম মেশিন দিয়েই গল্প শুরু করা দরকার।

সঞ্চালক বললেন,

-টাইম মেশিন পর্যন্ত আঙ্গা মারার সময় আজ পাবো কিনা জানি না, তবে পরিবর্তনশীল এটম নিয়ে কথা বলি আগে, তারপর সময় থাকলে বাকি বিষয় গুলো নিয়েও আলোচনা করা যাবে।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-ইঞ্জিনিয়ার তো ঘুমেই, নীরু সাহেব আর মুক্তি যদি চলে যেতে চায় চলে যাক, আপনি চালিয়ে যান যতক্ষণ আপনার এনার্জি আছে।

নীলু সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

-কাল নানকা সাহেব আসবেন, উনি আসা মানেই বিশাল হৈ চৈ; আমি একটু বিশ্রাম নিয়ে নেই; কোন সমস্যা হলে আমাকে একটা ফোন করে দেবেন, ১০ মিনিটের মধ্যে হাজির হব।

সঞ্চালক বললেন,

-আমাদের কাছে তো মোবাইল নেই।

মুক্তি বললো,

-আমার কাছে আছে কাকা, ওনার মোবাইল নাম্বারও নিয়ে নিয়েছি।

আমি বললাম,

-কোন ফাঁকে তুমি ওনার মোবাইল নাম্বার নিলা বুঝলামই না; আমার প্রথম কথা হ'ল, তুমিও যাচ্ছো নীলু সাহেবের সাথে, দ্বিতীয় কথা, মোবাইল থাকলে তো তুমি এমনিতেই ডিজএলাউড, এই আড্ডায় থাকতে পারবো না।

মুক্তি বললো,

-আমি কাকা আপনার বাইরে এক পা ফেলবো না এই দুইদিন, আপনি যেখানে আমিও সেখানে; মোবাইল অফ করে দিয়েছি অনেক আগেই।

সঞ্চালক মুক্তিকে মনে হল পছন্দ করে ফেলেছেন, বললেন,

-নীলু সাহেব যদি একা যেতে ভয় না পান, তবে রেস্টে যান, ফিরে যাবার পথ হারাবার ঝুঁকি ছাড়া আমাদের কোন অসুবিধা হবে না; মুক্তি আমাদের সাথেই থাকুক।

নীলু বললেন,

-আপনাদের পথ হারাবার কোন কারণ নেই; যদি কুয়াশার কারণে কোন গাছের সাথে গোত্তা না খান তাহলে এই পথই আপনাদের নিয়ে যাবে আপনাদের বাংলোর সামনে; আমি আমার মোবাইলের আলো ব্যবহার করে চলে যাবো, আপনাদের জন্য টর্চ রেখে যাচ্ছি।

আর কথা বাড়াবার সুযোগ দিলাম না নীলুকে, বিদায় জানালাম। মুক্তি আমাদের সামনে এনে একটা বিস্কুটের প্যাকেটে খুলে দিল আর ক্লাস্ক থেকে তিন কাপ চা এনে টেবিলে রেখে বললো,

-কাকা, চলেন টাইম মেশিনে চড়ি।

ততক্ষণে রাত বেজে গিয়েছে প্রায় বারোটা। শুরু হল আমাদের আড্ডা, নিশুতি রাতের গল্প।

## **নিশুতি রাতের গল্পে**

সঞ্চালক আজ বেশ নিরবচ্ছিন্ন কথা বলার সুযোগ পাবেন বলে আশা করছি। এই ক্লাবের আমি আসলে শ্রোতা সদস্য। ক্যামেরাম্যান কিছু তত্ত্ব নিয়ে হাজির হন মাঝে মাঝে। বাকি সব তো অনুপস্থিত। সঞ্চালকও বিষয়টা অনুধাবন করে বেশ আয়েশের সাথে কথা বলা শুরু করলেন,

-মুক্তি, তুমি আমাদের ক্লাবের নতুনতম সদস্য; তোমাকে দুই চারটা কথা বলে রাখা ভাল; তুমি যে ভাবে টাইম মেশিনে চড়ার আগ্রহ নিয়ে বসে আছো সেই আগ্রহের গরম ভাতে কিছু পানি ঢালা প্রয়োজন; তুমি টেলিভিশনের "টক শো" গুলো দেখো কি??

মুক্তির উত্তর দেবার ভঙ্গীতেই বোঝা গেল সে খুব খুশী তাকে কাকাদের ক্লাবের সদস্য বলায়,

-স্বি কাকা, সুযোগ পেলে ছাড়ি না; মাঝে মাঝে বড় বড় নামী দামী মানুষ গুলো যখন শুধু একজন আরেকজনকে গালি গালাজ করেই থামেনা, হাতা হাতিও শুরু করে তখন কি যে মজা লাগে কাকা; সেদিন তো এক টক শো'তে কি একখান কথা বলে একজন নামী মানুষ ছয় মাস জেলই খাটলো।

সঞ্চালক বললেন,

-ঐ টক শো'য়ের অবস্থা আর আমাদের এখানে যে কথাবাজি চলে তার মাঝে দুইটা মৌলিক পার্থক্য আছে; এক, আমরা যে যাই বলি সেটা যৌক্তিক পর্যায়ে থাকে বলেই হয়তো কখনো গালাগালি মারামারি পর্যন্ত গাড়াই না; দুই, আমরা যাই বলি তার বেশীর ভাগই যদিও আমাদের ভাবনার কথা কিন্তু সেই ভাবনা কোন আকাশ কুসুম কল্পনা ভাবনা কিংবা নিজেকে জাহির করার ইচ্ছে থেকে বলা কোন পংক্তিমালা নয়; কেউ যদি রেফারেন্স চায়, কোন না কোন রেফারেন্স থাকবে কিন্তু তার মানে এই না, আমরা যা বলছি সেটা চরম সত্য কিছু।

আমি আমার ভাতিজার পক্ষ নিয়ে বললাম,

-ওকে নিয়ে টেনশন করার দরকার নাই। আপনি যা বলবেন তার সাথে এক ডিগ্রী রঙ সে লাগাবেই, বললাম না, অদ্ভুত কথা বলায় তার পিএইচডি করা আছে।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-মুক্তি তাহলে বোধহয় আমাদের গল্প শুরু করার আগেই টাইম মেশিনে চড়ে বসে আছে।

মুক্তি একটু শংকা নিয়েই বললো,

-কাকা, আপনারা যদি বলেন, আমি আর জীবনেও টেলিভিশনের টক ঝাল মিষ্টি কোন শো দেখবো না।

এই ভুতুরে পরিবেশে সঞ্চালক বেশ জোড়েই হেসে উঠলেন বলে মনে হল, বললেন,

-দেখো, টক শো দেখো, না নেই; ওদের গলাবাজির সাথে আমাদের প্যাঁচালের পার্থক্যের কথাটা তোমাকে বলে রাখলাম; ঐ টক শো গুলোতে সব বিষয়ে একই মানুষ কথা বলে, আমরাও তাই করি; তাদের বলা কথা গুলোর যেমন সেই বিষয় সমাধানে কোন প্রভাব ফেলে না, তেমনি আমাদের প্যাঁচালিক ভাবনা গুলো সেই বিষয়ের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না; তুমি শুধু উত্তেজিত হয়ে আমাদের জেলে পাঠানোর মত কোন কথা বলে বসো না।

মুক্তি একেবারে আকাশ থেকে পড়লো,

-কাকা, আমি পাঠাবো, আপনাদের, জেলে??

সঞ্চালক বললেন,

-যাক বুঝে নিলাম যে তুমি বুঝো নাই; শোন, তুমি যদিও টাইম মেশিনে চড়ার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছে কিন্তু আমার বিশ্বাস মানুষ টাইম মেশিনের আগে টেলিপোর্টেশনের ব্যবস্থা করে ফেলবে।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-যে সিমুলেশন দেখেছি সেটাতে করে আমার বিশ্বাস, আগে টাইম মেশিন আসবে; নয়তো তারা সিমুলেশন বানাতো না।

সঞ্চালক বললেন,

-আপনার বিশ্বাস আপনার আমার বিশ্বাস আমার; বিশ্বাস এবং প্রেমের ক্ষেত্রে কোন মুক্তি খাটেনা।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-দেখুন, ষাটের দশকে তার বিহীন টেলি-যোগাযোগের কথা সাধারণ মানুষের ভাবনাতেও ছিল না; ৭৮ সালের দিকে আমি প্রথম পড়লাম যে, তার বিহীন তো বটেই সেখানে আবার নাকি কথা বলার সময় ছবিও দেখা যাবে; অথচ তার বিহীন মোবাইল যোগাযোগ কিন্তু ষাটের দশকেই আবিষ্কৃত হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করাও শুরু হয়েছে; আসলে সব কিছুই বানিজ্য; বানিজ্যিক ভাবে লাভজনক হবার পর্যায়ে যতক্ষণ কোন আবিষ্কার না যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কাছে সেটা অজানাই থেকে যায়।

সঞ্চালক বললেন,

-একটা দারুন কথা বললেন, আজকাল সবই বানিজ্য; বই মেলার কথাই ধরুন, আজকাল এতো মানুষ যায় যে, পা ফেলার উপায় থাকে না, মেলার আয়তন, আয়োজন, ক্রেতা, বিক্রেতা সবই বেড়েছে, সেই তুলনায় প্রকাশকের স্টল বাড়েনি; অথচ বই মেলার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার বই প্রকাশনাকে উৎসাহিত করা; মেলায় যেয়ে দেখেন, বই প্রকাশকের সংখ্যা কম, বই বিক্রেতার দোকান, খাবারের দোকান আর গান-আবৃত্তির দোকান দিয়ে মেলা সয়লাব।

আমি বললাম,

-না ভাই, আপনার কথা মানতে পারলাম না; তবুও তো বই মেলা হচ্ছে আমার দেশে, জ্ঞানের চর্চা, ভাষার চর্চাটা তো রইলো, বানিজ্য না হয় কিছু থাকলোই; সেদিন মজার একটা লাইন পড়লাম; কোন এক মহামানব বা বাণী প্রদানকারী বা পাগলও বলতে পারেন, অথবা, যেহেতু সংগ্রহিত বাণী, অতএব, আমিই বলেছি বলতে পারেন।

সঞ্চালক আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

-থামেন থামেন, আপনি এখনো জীবিত আছেন তো নাকি।

আমি বললাম,

-তাইতো মনে হচ্ছে।

সঞ্চালক বললেন,

-তাহলে এটাকে আপনার বাণী হিসেবে মানলাম না; পৃথিবীতে যত বাণী দেখবেন তার কমপক্ষে ৯৫% মৃত মানুষের।

সঞ্চালকের কথার হিউমারটুকু বুঝতে আমার একটু সময় লাগলো, বললাম,

-আচ্ছা ঠিক আছে, আমার বাণী না, হয় তো কোন এক মৃত মানুষের বাণী, কথাটা অনেকটা এরকম, যখন দেখবে কোন দেশে ফুটপাতে ফেলে বই বিক্রি হচ্ছে আর কাঁচের শো'কেসে সাজিয়ে জুতো বিক্রি হচ্ছে, তখন বুঝবে সেই জাতির কপালে জুতার বাড়ি দেবার সময় সমাসন্ন।

সঞ্চালক বললেন,

-তারমানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, যেন তেনো ভাবে বই মেলা সম্পন্ন করা গেলে আমাদের জাতির কপালে জুতার বাড়ি পরবেনা।

ক্যামেরাম্যান হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন,

-ভাই, আপনি তো বলেছিলেন ভাবনা ক্লাবের কথা আপনি ছাড়া আর কেউ লিখতে পারবে না, আপনাকে তো আমরা এক্সক্লুসিভ রাইট দিয়ে রেখেছি, আপনি লিখে যাচ্ছেন তো।

আমি বললাম,

-আমার বাবার একটা অভ্যাস ছিল প্রতিদিন ডায়েরী লেখার, বাবার মতই আমিও প্রতিদিন ডায়েরী লেখার মত করে ভাবনা ক্লাবের কথা গুলো লিখে রাখছি।

সঞ্চালক বললেন,

-ভাই হতাশ করলেন, আশা নিয়ে বসে আছি আপনার লেখা আমাদের বই পড়বো আমরা, আমাদের ভাবনা গুলোকে ছাপার হরফে দেখবো আগামী বই মেলায়।

আমি বললাম,

-আমার লেখালিখির একটা শখ আছে তাই লিখি কিন্তু সেটা কাউকে পড়াতে হবে সেই ভাবনা আমার মাথাতে নেই; দু'একবার যে ছাপাবার চেষ্টা করিনি সেটা নয় কিন্তু প্রকাশকের কাছে ধল্ল্যা দেয়ার মত এনার্জি পাইনা; কষ্ট করে লিখবো আবার কষ্ট করে প্রকাশককে তেলও মারবো এতো সময় কই; তবে আপনারা যদি পড়তে চান, ডায়েরী দিতে পারি, পড়ে বলবেন ভাবনা ক্লাবের কথা গুলো যথায় যথায় লিখেছি কিনা।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-আপনার ওপর খুব রেগে গেলেও রাগ প্রকাশ করলাম না; আসলেই, রাজনীতি, পেটনীতি, সমাজিক দায় দায়ীত্বের ফাঁকে লেখাটা দুঃসাধ্য কাজ প্রায়।

আমি বললাম,

-আমাদের একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে; যারা রাজনীতির সাথে যোগাযোগ রাখে, তাদেরও ঘর-সংসার আছে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন আছে; ভাবনা গুলোকে ছাপার হরফে না আনার কারণ অনেক; একটা গল্প শোনাই তাহলেই কিছুটা বুঝবেন হয়তো; আমার নির্বাচনী এলাকায় একজন রাজনৈতিক নেতা আছেন, তাকে আমি অতিরঞ্জিত রাজনৈতিক নেতা বলি; তার মাথায় স্থানীয়, জেলা পর্যায়, বিভাগীয় পর্যায়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতির সকল বিষয়ই ভাল খেলা করে; আমি মাঝে মাঝেই তাকে সহ আমার আরও অনেক প্রিয় মানুষকে কিছু মজার গল্প বা জোত্র পাঠাই; প্রতিবারই তার উত্তর আসে অনেকটা এরকম,

আপনি গল্প দিয়ে কি বোঝাতে চাইলেন, কাকে দিয়ে কোন চরিত্র বোঝাতে চাইলেন সেটার গুঢ় রহস্য উদ্ধার করতে পারলাম না; আসলে তার মাথাতেই নেই যে, এটা নিছক একটা মজার গল্পই, এর মাঝে কোন রাজনীতি নেই; তেমনি, আমাদের ভাবনা ক্লাবের ভাবনা গুলো যে শুধুই কিছু ভাবনা, সেটা অনেকেই বুঝতে পারবে না হয়তো।

সঞ্চালক বললেন,

-আমাকে একটা কথা বলেন তো, আমরা বাইরে থেকে যতটুকু জানি, সিলেটের বেশীর ভাগ মানুষের দ্বিতীয় বাড়ি ইংল্যান্ড, আপনার আত্মীয় স্বজনের অবস্থাও কি এক।

আমি বললাম,

-ভাই, এটা ঠিক যে, আমার গ্রামে আমার যত জন আত্মীয়-স্বজন বসবাস করেন তার চেয়ে বেশী আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বসবাস করেন ইংল্যান্ড; কিন্তু প্রবাসীদের প্রান ভোমড়া বাঁধা আছে সেই গ্রামেই এবং বাংলাদেশের মানুষের কাছেই।

সঞ্চালক বললেন,

-হুম, সেই জনাই সিলেট বিভাগে স্থানীয় নির্বাচন থেকে শুরু করে সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত প্রবাসীদের মেলা বসে যায়।

আমি বললাম,

-ভাইরে, আজ অন্তত এসব কথা নিয়ে আলাপ করি না আমরা; ছিলাম বই মেলাতে ওখানেই থাকি না কেন; অবান্তর বিষয়ে যদি আলাপ করতেই চান তবে বলেন, "বউ" মেলার কথা; বই মেলার বানিজ্যিক চরিত্র তবুও মানা যায় কিন্তু "বউ মেলা"র কি করবেন; এটার আবিষ্কর্তা কে, ওখানে কি বউ পাওয়া যায়, এই মেলায় কারা যায় তার কিছুই আমি বুঝি না।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-আমার ধারণা বউ মেলাটা এসেছে পশ্চীমা বিশ্বের ব্রাইডাল ফেয়ার থেকে; ওখানে বেশীর ভাগ মানুষের হাতে সময় কম থাকার কারণেই হোক আর খরচ বাঁচাবার চেষ্টাতেই হোক, চার্চে বা কোর্টে যেয়ে বিয়ের কাজটা সেরে ফেলে; অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ বড় আকারে বিয়ের আয়োজন করে; সেই অল্প সংখ্যক মানুষের হাতেও এতো সময় নেই যে সব আয়োজন সুন্দর ভাবে করতে পারে; তাছাড়া সামাজিক রেশারেশি তো আমাদের সমাজের মতই ওখানেও আছে; ব্যাস, তৈরী হয়ে গেল একটা দালাল গোষ্ঠী, "ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী"; পশ্চীমা এই মেলায় বিয়ে করতে আগ্রহীরা যেমন খুব বেশী একটা যায়না, আমার ধারণা আমাদের এখানেও যায় না; পশ্চীমা বিশ্বের ব্রাইডাল ফেয়ারের একটা ডকুমেন্টারী দেখেছিলাম, আহা, কি নাই ওখানে; বিভিন্ন ভেন্যুর প্রতিনিধির স্টল, নাচ শেখার স্টল, নাচের গ্রুপের স্টল, শরীর চর্চা কেন্দ্রের স্টল, ঘটক স্টল থেকে শুরু করে বিয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের স্টল ওখানে আছে; সাথে থাকে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানীর স্টল, যারা এই মেলার মূল কেন্দ্রবিন্দু; তারা অন্য সব স্টলের সাথে কমিশনের আলাপ থেকে শুরু করে সব ধরনের আলাপ করে তাদের মুনাফা নিশ্চিত করে।

আমি বললাম,

-পশ্চীমা "ব্রাইডাল ফেয়ার" বুঝলাম কিন্তু আমাদের এখানে কি হচ্ছে?

সঞ্চালক বললেন,

-আমাদের এখানেও একই জিনিস হচ্ছে, অনেকদিন হলই হচ্ছে, আপনার নজরে এসেছে হয় তো অল্প কিছুদিন; কারণ, কোন না কোন মাধ্যম এই বিষয়টিকে জমকালো ভাবে উপস্থাপন করে, সমাজের রাইভেলরিকে কাজে লাগিয়ে বিশাল বানিজ্য এবং প্রচার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মুক্তি আর থাকতে পারলো না, বললো,

-কাকা, টাইম মেশিন আগে না টেলিপোর্টেশন আগে আবিষ্কার হবে।

সঞ্চালক বললেন,

-তুমি কোনটা আগে আসবে বলে মনে কর।

মুক্তি বললো,

-আমি আপনার দলে; সেদিন একটা খবর দেখলাম, কি একটা অনু কণা না পরমানু কণা টেলিপোর্টেশন, মানে কোন বাহন বা মাধ্যম ছাড়া চাঁদে না কোথায় পাঠানো হয়েছে।

সঞ্চালক বেশ খুশী মনে বললেন,

-ক্যামেরাম্যান, আমার দল ভারী হইলো, হিংসা কইরেন না মনে মনে।

ক্যামেরাম্যান হাসতে হাসতে বললেন,

-নাহ, আমার ভাবনের জগতের একাকিস্ব আমি উপভোগ করি, নিজের ভাবনার জগতে আরেক জনকে যায়গা দেবার মত জ্ঞানী আমি না।

সঞ্চালক বললেন,

-বুঝলো কিছু ভাতিজা, একেই মনে হয় বলে আগুর ফল টক; যাক, আমি আসলে অন্য কারনে মনে করি টেলিপোর্টেশন আগে আসবে; পৃথিবীর বহু উন্নত দেশই পরশ পাথরের খোঁজ করছে বহুদিন।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-আপনি পরিবর্তনশীল পদার্থের কথা বলছেন তো, সেটা তো আছেই এবং এটা করার ক্ষমতা বিশ্বের প্রায় সকল উন্নত দেশেরই আছে; তারা ইচ্ছে করলেই পানি থেকে সোনা বা জ্বালানী তেল তৈরী করতে পারে।

সঞ্চালক বললেন,

-সেটাতো আছেই, কিন্তু বানিজ্যিক ভাবে লাভজনক না হওয়ায় এখনো এটা প্রয়োগ করে পানি বা অন্য কোন পদার্থকে সোনা বা জ্বালানী তেল বানাবার কোন মানে হয় না বলে তারা সেটা করছে না; তবে আমি মনে করি পৃথিবীর একটি দেশ কম খরচে সেটা করার মত টেকনোলজি পেয়ে গিয়েছে; তারা ইচ্ছে করলেই কম খরচে পদার্থের পারমাণবিক স্ট্রাকচার বদলিয়ে সোনা বা তেল বা অন্য কোন পদার্থ তৈরী করতে পারে; যে কারনেই আমি বিশ্বাস করি আগামী ২০২৫ সালের মধ্যে পৃথিবীর রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আসবে; পৃথিবীর অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এখন সোনা এবং পেট্রো ডলারে উপর নির্ভরশীল; এই টেকনোলজি ব্যবহার করা শুরু করলে ঐ দুটোই হয়ে পরবে মূল্যহীন; তখনই প্রয়োজন দেখা দেবে নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনার; ইউরোপের বহুদেশ, এশিয়ার কিছু দেশ এখন প্রস্তুতি নেয়া শুরু করে দিয়েছে নতুন পৃথিবীর জন্য।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-আমি যদি ভুল না বুঝে থাকি, আপনি চীনের দিকে ঝুঁকি করছেন; চীন তার নিজের বাড়ির আগুনা "সাউথ চায়না সী"তেই যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি প্রদর্শনে কোন বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখেনা; শুধু "ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড" দিয়েই আপনি মনে করছেন তারা পৃথিবীর সব কিছু ওলট পালট করে দিয়ে পৃথিবীর বর্তমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

সঞ্চালক বললেন,

-দেখুন, আমি যে টেকনোলজির কথা বলছি, সেই টেকনোলজি ব্যবহার করার সাথে সাথেই পৃথিবীর বর্তমান মুরুব্বীদের মাথা খারাপ হয়ে যাবে, তাদের হাতে থাকবে মাত্র দুটো অপশন, এক, যোগ দাও নতুন সিস্টেমে, নয়তো দুই, পৃথিবী ধ্বংস করে দাও; তাছাড়া চীন হয়তো এখনো প্রস্তুত না পৃথিবীর বর্তমান শক্তি গুলোর আক্রমণাত্মক অবস্থান মোকাবিলা করার জন্য; সাউথ চায়না সী নিয়ে তো সমস্যা না, সমস্যা সাউথ চায়না সীতে মানব সৃষ্ট দ্বীপ নিয়ে; বর্তমান বিশ্ব শক্তি মনে করছে ওটা আক্রমণাত্মক অবস্থান হিসেবে চীন ব্যবহার করবে, কিন্তু আমার ধারণা, ঐ দ্বীপ নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য, নতুন পৃথিবীর ভবিষ্যত ব্যবস্থাপনায় চীনের রক্ষণাত্মক অবস্থান নিশ্চিত করা।

মুক্তি বলে উঠলো,



-কাকা, আপনারা কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছি না।

সঞ্চালক বললেন,

-সব বোঝার প্রয়োজন কি।

মুক্তি বললো,

-একটু চেষ্টা করেন কাকা, বুঝেও তো ফেলতে পারি।

সঞ্চালক বললেন,

-ঠিক আছে, বৈশ্বিক রাজনীতির অংশটুকু বাদ দিয়ে ছোট করে বোঝাবার চেষ্টা করি; মানুষ অনুকে ভেঙ্গে পরামানুর খোঁজ পেয়েছে বছরদিন; ইলেক্ট্রন প্রোটন এবং পরামানুর গঠনের সম্পূর্ণ মেকানিজম মানুষের হাতের মুঠোতে এসে গিয়েছে সে-ও বছরদিন; পদার্থের প্রকার ভেদ কিন্তু পরমানুর ভেতরে অবস্থিত প্রোটন, নিউট্রন আর ইলেকট্রনের উপর নির্ভরশীল; এখন তুমি যদি একটি যে কোন পদার্থের ভেতরের এই মেকানিজমকে ভেঙ্গে দিয়ে নিজের মত করে সাজাবার ক্ষমতা রাখো, তখন খুব সহজেই পানিকেও সোনা বানিয়ে ফেলতে পারবে।

মুক্তি বললো,

-তাহলে তো কাকা আপনার কথাই ঠিক, টাইম মেশিনের আগেই চলে আসবে টেলিপোর্টেশন।

সঞ্চালক বললেন,

-আমার বিশ্বাস সেটাই; মানুষের সম্পূর্ণ জিন ম্যাপিং করার কাজ শেষ, এটা প্রকাশ করা হচ্ছে না সামাজিক বিশৃঙ্খলার ভয়ে; মানুষ যেহেতু এখন ক্লোন করতে পারে, সেহেতু যে কোন বস্তুকে ভেঙ্গে দিয়ে অন্য যায়গায় পাঠিয়ে আবার একত্রিতও করতে পারবে; থ্রি ডি প্রিন্টার তো এসেই গিয়েছে; আমরা তখন নিয়ে কথা বলবো না, তখন জানতে হলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স, থিয়োরী অব জেনারেল রিলেটিভিটি, থিয়োরী অব স্পেশাল রিলেটিভিটি সহ আরো বহু থিয়োরী কপচাতে হবে।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-আপনি বস্তু জগত আর প্রানী জগতকে এক করে ফেললেন; প্রানীকে টেলিপোর্টেশন করতে হলে আগে প্রানের সংজ্ঞা আপনি আলাদা করবেন তো।

সঞ্চালক বললেন,

-আসছি সে কথায়, আগে বস্তুর সংজ্ঞাটা নির্ধারণ করে নেই।

আমি বললাম,

-আপনি তো ফিজিক্স, ক্যামিস্ট্রি, বায়োলজি, ফিলোসফি, ম্যাথ সব এক করে ফেললেন।

সঞ্চালক বললেন,

-মহাবিশ্বের শুরুটা কিন্তু এক বিন্দু থেকেই শুরু বলে আমি মনে করি, সেটা কুন, ওম, হিব্রুর সেই তিন অক্ষর দিয়ে তৈরি শব্দই হোক আর বিগ ব্যাং অথবা স্ট্রিং থিয়োরী যাই বলেন না কেন, সব জ্ঞানই আদীতে এক ছিল, কিন্তু মানুষ জ্ঞানের ব্যাপ্তি বুঝতে পেরে গবেষনার সুবিধার্থে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে নিয়েছে; এমন একটা সময় আসবে যখন আবার সব জ্ঞান এক যায়গায় যেয়ে মিলবে; আপনিই আমাকে বলেন, এরিস্টোটলকে আপনি দার্শনিক বলবেন নাকি বিজ্ঞানী বলবেন।

আমি বললাম,

-ভাই, আওলাইয়া গেছি, আমারে প্রশ্ন কইরেন না।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-তারমানে আপনি দর্শনকেও সাইন্সের কাতারে ফেলে দিচ্ছেন।

সঞ্চালক বললেন,

-দর্শন তো ফাদার অব সাইন্স।

মুক্তি আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারলো না,

-কাকা, টাইম মেশিন টাইম মেশিন, ঐটার কথা বলেন।

বুঝলাম ভাতিজা আমার খুব মজা পাচ্ছে; বললাম,

-ভাতিজা, তুমি কি মনে মনে কোন অদ্ভুত গল্প তৈরী করতেছো নাকি।

মুক্তি বললো,

-কাকা, আপনারা তো বলেন আমি সব অদ্ভুত গল্প তৈরী করি; আমার গল্পের সূত্র কিন্তু বিভিন্ন সময়ের উপকথার সাথে আমার নিজেস্ব ভাবনার একটা মিশেল; আজ আপনাদের কথায় আমি কেন যেন আমার গল্পের একটা ব্যাখ্যা পেতে চলেছি।

আমি বললাম,

-তাহলে আজ কাকাদের তোমার গল্প শোনাও।

মুক্তি বললো,

-শোনাবো কাকা, আমি এতোদিন পর্যন্ত আমার ঐ সব গল্পের সময়ের হিসেব মেলাতে পারছিলাম না, এখন মনে হচ্ছে পারবো; আগে কাকার কাছ থেকে সময়ের বিষয়টা পরিষ্কার হ'য়ে নেই, তারপর আমার গল্প শোনাবো।

সঞ্চালক বললেন,

-বাবা মুক্তি, তুমি সময়কে বেশী গুরুত্ব দিচ্ছো, তুমি কি বলতে পারো সময় মানে কি?

মুক্তি কিছুটা হতভম্ব,

-কেন কাকা, এই যে, আমার ঘড়িতে এখন সারে বারোটা বাজে, তার মানে, সময় এখন রাত সারে বারোটা।

সঞ্চালক বললেন,

-ভাতিজা, ওটা একটা আপেক্ষিক কথা বললো, যেমন, একটা সরল রেখার দৈর্ঘ্য কতটুকু; ইঞ্চি, ফুট বা মিটার নামের শব্দ গুলো সবই মানুষের তৈরী একেকটা পরিমাপক একক; তেমনি তোমার হাতের ঘড়ির সময়টিও মানুষের তৈরী একটি একক মাত্র; তুমি কি জানো, মানুষের তৈরী সবচেয়ে শক্তিশালি রকেট এপোলো ১০ এর গতি ছিল ঘন্টায় প্রায় ২৫ হাজার মাইল; সেটা যখন পৃথিবী ছেড়ে গিয়ে তার সর্বোচ্চ গতিতে পৌঁছালো, তখন পৃথিবীর ঘড়ির সাথে এপোলো ১০ এর ঘড়ি পিছিয়ে গিয়েছিল।

মুক্তি অবাক হয়ে বললো,

-বলেন কি কাকা, তাহলে তো এপোলো ১০ এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ দেখে এসেছে।

সঞ্চালক বললেন,

-হ্যা, সেকেন্ডের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের জন্য হলেও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ দেখে এসেছে।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-আপনি তো যাদুর বাস্তো খুলে বসার চিন্তা করছেন, স্পেস টাইম, গ্র্যাভিটি, টাইম ডাইলেশন এতোসব বিষয় ব্যাখ্যা করে আপনি কোন যায়গায় যেতে চাইছেন।

সঞ্চালক বললেন,

-টাইম মেশিন নিয়ে আপনিই কথা তুলছেন আর ভাতিজা এখন সেই টাইম মেশিনে উঠবার জন্য অস্থির হয়ে বসে আছে।।

তারপর সঞ্চালক শুয়ে থাকা ইঞ্জিনিয়ারের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে বললেন,

-তবে আমার ইচ্ছা স্ত্রী নিয়ে কথা বলা।

স্ত্রী শব্দটা বোধহয় মাথায় গেঁথে গিয়েছে ইঞ্জিনিয়ারের। সঞ্চালকের মুখ থেকে স্ত্রী শব্দটি বের হবার সাথে সাথে ঘুম থেকে সটান উঠে বসে বললো,

-নো স্ত্রী, এই স্ত্রীনের দীঘির পাশে বইসা এই রাইতে স্ত্রী নিয়া কোন আলাপ না।

ইঞ্জিনিয়ার উঠে দাঁড়িয়ে এক কাপ কফি নিয়ে চেয়ারে বসতে বসতে মুক্তির দিকে তাকিয়ে বললো,

-বাবা মুক্তি, কি ওষুধ খাওয়াইলায়বা, শুইবার লগে লগে ঘুম; এককাপ কফি খাইয়া ঘুম ছুটাই; নইলে এই সঞ্চালকে স্ত্রী আইন্না হাজির করবো; কড়া পাহারায় বইলাম আমি।

ইঞ্জিনিয়ারের কথায় নিজের মনের মাঝে বোধহয় অস্বস্তি কাজ করেছিল। নিজের অজান্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে আড়মোড়া ভাঙ্গার ভঙ্গীতে চারপাশে চোখ বুলিয়ে আনলাম। আসলেই এক আধিভৌতিক পরিবেশ। সামনের আগুন প্রায় নিভু নিভু কিন্তু অল্প অঙ্গার গুলো মনে হল রূপকথার রাক্ষসের ধিকিধিকি আগুনে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কুয়াশার কারনেই হোক আর চার্জার আলোটের চার্জ কমে যাবার কারনেই হোক, পেছনে জ্বালিয়ে রাখা চার্জারের আলো প্রায় দেখা যাচ্ছে না বললেই চলে। সেই আলো আধাঁর আর কুয়াশার খেলায় আমাদের অস্পষ্ট চেহারা গুলো আসলেই প্রহেলিকাময়। নিজের ভয় বাকি সকলের কাছে লুকিয়ে রাখবার জন্য আমি আগুনের পাশে রাখা ডালপালা গুলো থেকে কিছু কুড়িয়ে নিয়ে আগুনের উপর দিতে দিতে বললাম,  
-শীতের অবস্থা দেখেছেন, একেবারে জমিয়ে দিচ্ছে।

আমার সব কাজই সঞ্চালক বেশ গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। কি বুঝলেন জানি না, বললেন,  
-ভাতিজাকে বরং টাইম মেশিনের গল্পই শোনাই; শোন ভাতিজা, আমাদের ব্রেইন শুধুমাত্র তিনটি ডাইমেনশন বা মাত্রাকে ধারণ করতে পারে; যেমন, একবিন্দু থেকে আরেক বিন্দু পর্যন্ত যদি একটা রেখা টানো, সেটা একটি মাত্রা, এর সাথে দৈর্ঘ্য প্রস্থ যোগ করলে দুইটি মাত্রা পেলো, আর যদি গভীরতা যোগ কর তাহলে পেলো ত্রিমাত্রিক একটি অবস্থা; আমরা সাধারণ দৃষ্টিকোন থেকে ব্রেইনের কাছ থেকে এই ত্রিমাত্রিক সিগনাল পর্যন্তই পাই; কিন্তু আইনস্টাইনের থিয়োরী অনুযায়ী আরেকটি মাত্রা আছে, যেটার নাম “সময়”; এই মাত্রাটি আমাদের ব্রেইনের সাধারণ কার্যক্রমের প্রসেস করার ক্ষমতা নেই।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-ভাই, এখন কিন্তু ফোর্থ ডাইমেনশনের তত্ত্বের সাথে পঞ্চম মাত্রা থেকে শুরু করে ষষ্ঠ, সপ্তম, একাদশ মাত্রা এমনকি কয়েকজন তো ২৫/২৬ মাত্রা নিয়েও কথা বলছে।

সঞ্চালক বললেন,

-তাত্ত্বিক ভাবে সব মাত্রাই ঠিক আছে, কিন্তু সব মাত্রাই আগের মাত্রার উপর নির্ভরশীল; প্রথম মাত্রা না থাকলে দ্বিতীয় মাত্রা হিসেবেই আসবেনা, তেমন তৃতীয় মাত্রা না থাকলে চতুর্থ মাত্রাও আসবে না; আমরা যতক্ষণ চতুর্থ মাত্রাকে সম্পূর্ণ প্রমাণ করতে না পারছি ততক্ষণ ২৫/২৬ মাত্রা নিয়ে আলাপ করার কোন মানেই হয়না; আমার মতে, আমরা চতুর্থ ডাইমেনশন প্রমাণ করে ফেলেছি প্রায়, সুতরাং, আমরা খুব বেশী আলাপ করলে পঞ্চম মাত্রা নিয়ে আলাপ করতে পারি।

ইঞ্জিনিয়ার আর চুপ থাকতে পারলেন না, বললেন,

-ঐ মিসারা, কি পাইছেন আপনারা; গল্প করার লোভ দেখাইলেন ঢাকায় বইসা; এইগুলো কোন গল্প হইলোনি; খিতাবা ভাতিজা, তুমি কুনতা বুঝায়নি।

মুক্তি বুক আর নাই বুক, সে মজা যে পাচ্ছে সেটা তার উত্তরেই বোঝা গেল। সে সঞ্চালকের কিছুক্ষণ আগে তাকে বলা কথাটির পুণিরাবৃত্তি করে বললো,

-সব বিষয় বুঝতেই হবে কাকা সেইটা ঠিক না; এই যে আপনে আমার সাথে সিলেটি কথা বলার চেষ্টা করতেছেন, সেই সিলেটি কথা ঠিক ভাবে হচ্ছেনা জেনেও আমি তো আপনাকে কিছু বলি নাই কিংবা ধরেন নিবারনের দল তাদের ভাষায় যে গানটা শোনাইলো, সেইটা আপনে আমি কতটুকু বুঝলাম কিন্তু শুনতে তো খারাপ লাগে নাই।

পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির রহস্যময় পরিবেশকে উপহাস করার জন্যই হয়তো সঞ্চালক এমন বিকট শব্দে হেসে উঠলেন যে, আমি চমকে উঠলাম। হাসির শব্দের ফাঁকে ফাঁকে বললেন,

-ইঞ্জিনিয়ার আমাদের সাথে এতোদিন থেকেও আমাদের ভাবনা ক্লাবের গল্পের কারণ, ধরন হজম করতে পারলো না আর ভাতিজা কিনা কয়েক ঘন্টার মাঝেই সেটা হজম করে একেবারে সারমর্মে পৌঁছে গেল। ইঞ্জিনিয়ার আসলেই গর্দভ কিনা সেটা এবার ঢাকায় যেয়েই কোন ভাল ডাইগনিস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা করাতে হবে।

সঞ্চালকের হাসি শেষ হবার আগেই মুক্তি বললো,

-কাকা, আমার কিন্তু নিজেকে খুব বিস্ময়জন মনে হইতেছে। আমার ধারণা, ফোর্থ ডাইমেনশন, অর্থাৎ, সময়ের ডাইমেনশন শেষ না করে আপনি টাইম মেশিনে আমাকে নিবেন না।

সঞ্চালক হাসি থামিয়ে বললেন,

-বাহ, দারুন ধরেছে তো; সময়ের রহস্যের সমাধান ছাড়া সময়ের যাদু কলে ওঠা যে যাবে না সেটা কিন্তু আমাদের ইঞ্জিনিয়ারও বোঝে নাই।

ইঞ্জিনিয়ার বললো,

-অনেক বুঝছি, আমার আর বোঝা লাগবে না; পারলে আমারে ঢাকায় পৌঁছাইবার বন্দোবস্ত কর।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-আরে ইঞ্জিনিয়ার, আমরা তো শুধু ত্বষ কথা বলবো, টাইম মেশিন তৈরী করতে হলে আপনার মত ইঞ্জিনিয়ার না থাকলে চলবে।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

-এইতো আপনে লাইনে পরছেন, এখন আপনে খালি এই সঞ্চালকেরে বুঝাইয়া কন যে আমার গুরুত্ব কতখান।

সঞ্চালক বললেন,

-আহারে, এইটা আমাকে বোঝতে হবে কেন, ওপরওয়ালার সৃষ্ট সকল কিছুই মহা মূল্যবান, সকল কিছুই প্রয়োজনীয়, সেটা নিয়ে তো আমরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে আলাপ করার সময়েই স্বীকার করেছি, বুঝেছি যে, এমনকি নেকড়েই বল আর গাধাই বল, প্রকৃতির জন্য সবই মূল্যবান।

ইঞ্জিনিয়ার কঞ্চলের ফাঁক দিয়ে মুখ বের করে বসা অবস্থায় খুব গভীর ভাবে সঞ্চালককে পর্যবেক্ষন শেষে বললেন,

-আমারে খোঁচানো হইলো কিনা সেইটা এই কুয়াশা আর অন্ধকারের জন্য ঠিক বুঝা উঠতে পারলাম না।

ক্যামেরাম্যান তাকে আশ্বস্ত করে বললেন,

-আমার ধারণা উনি ভাল অর্থেই কথাটা বলেছেন; ভাই সঞ্চালক, আপনি সময়, টাইম মেশিন সম্পর্কিত কথা গুলো বলে ফেলেন, আর দেরী করলে বেচারা ভাতিজা দম আটকে মারা যেতে পারে।

ইঞ্জিনিয়ার বললো,

-এই যে, মরার কথা কইলেই তো ভয়ের কথা, ভূতের কথা, স্ত্রীনের কথা আইবো।

সঞ্চালক বললেন,

-ক্যান, আজকে সকাল থেকে যখন প্লেন এক্সিডেন্ট আর মরার কথা বলতামিলা তখন ভূতের কথা, স্ত্রীনের কথা মনে ছিল না।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

-তখন কি আমরা মাঝ রাত্রে স্ত্রীনের দীঘির পারে বওয়া আছিলাম নি।

সঞ্চালক বললেন, নাহ,

-এই মিস্তিরির সাথে কথা বাড়াইলেই কথা প্যাঁচ খাইতেই থাকবে, তারচেয়ে ভাতিজা তোমার সময়ের গল্পটা শেষ করি।

ভাতিজা আমারও

-“স্ত্রি কাকা” বলে একটু এগিয়ে এসে বসলো।

শুরু হল সঞ্চালকের সময়ের কথাঃ

-চতুর্থ মাত্রা বা ফোর্থ ডাইমেনশন এক বিশাল সাবজেক্ট; কাছাকাছি কিছু বিষয় আছে যেটা আলাপ না করলে তুমি তোমার জীবদ্বশায় টাইম মেশিনে চড়ার সম্ভবনা কতটুকু সেটা বুঝতেই পারবেনা; আমি শুধু বিষয় গুলো সহজ ভাষায় ছুঁয়ে যাবো; আমরা ঘড়ি দিয়ে পৃথিবীতে যে সময় মাপি সেটা সময়ের কোন সংজ্ঞায় পরে না; সময় বলতে আসলে মহাবিশ্বের সময় বোঝানো হয়, আর আইনস্টাইন সেই সময়কে মেপেছেন মহাশূন্যের মাঝ দিয়ে আলোর গতি যা হবে সেটা দিয়ে, অর্থাৎ, প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ত্রিশ কোটি মিটার; ওনার ত্বষটা অনেকটা এরকম,

তুমি যদি আলোর গতির সমান গতিতে চলতে পারো তবে তোমার সময়ের কাটা থেমে যাবে, তারমানে, তোমার তুলনায় পৃথিবীর ঘড়ির কাটা এগিয়ে যেতে থাকবে, অর্থাৎ, তোমার অবস্থান থেকে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ দেখতে পারবে।

সঞ্চালকের কথা চলছে,

-আর যদি তুমি আলোর গতির চেয়ে বেশী গতিতে চলতে পারো তখনই ঘটবে মজার বিষয়, তোমার ঘড়ির কাটা পিছন দিকে চলা শুরু করবে, অর্থাৎ, তুমি তোমার তুলনায় পৃথিবীর অতীত দেখতে পারবে; এই তত্ত্ব কিন্তু আইনস্টাইন ঝেড়েছেন ১৯১৫ সালে; মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করার জন্য একটা কথা বলে রাখি, এই কিছুদিন আগেও মানুষের জ্ঞান অনুযায়ী আলোর গতিকে অতিক্রম করা অসম্ভব বলে মনে করা হত; মাত্র কিছুদিন হ'ল আলোর গতিকে অতিক্রম করার বিষয়ে যেটা বিজ্ঞানীদের আশাবাদী করে তুলেছে তার নাম "টাইশনিক পার্টিক্যাল"; যাক, এতো তত্ত্বকথার প্যাঁচ নিয়ে কথা বলার প্রয়োজন নেই; মূল কথা হল, বিজ্ঞানীরা তাত্ত্বিকভাবে এখন বিশ্বাস করেন যে, অতীত এবং বর্তমান দু'টোতেই যাওয়া সম্ভব; কিন্তু প্রায়োগিক ক্ষেত্রে এর ব্যবহার হয়তো এখনো বহু দূরের ভাবনা; তবে বিজ্ঞানের জগতে আরেকটি ঘটনা ঘটেছে, আলোর কণা "ফোটন" কে ক্যামেরার মাধ্যমে ধরা সম্ভব হয়েছে, আর সেই কারণেই আমি মনে করি, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে বিজ্ঞান এমন পর্যায়ে যাবে, যখন পরমানু সম ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র একটি মিনিয়চার ক্যামেরার মাধ্যমে অতীত এবং ভবিষ্যতের ছবি তুলে আনা বিজ্ঞানের পক্ষে সম্ভব হবে।

ইঞ্জিনিয়ার ক্ষেপে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললো,

-ঐ মিয়া, আমরা পাগল পাইছোনি, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সকল খানে একই সময়ে যাইবা, সময়ের কোন দামই নাই নাকি।

সঞ্চালক বললেন,

-এই মানুষটারে নিয়া ভালই বিপদে আছি; নিজেই নিজেই একবার গাধা কয়, একবার পাগল কয়; এতো উত্তেজিত হইওনা, আমরা সবসময়ই অতীতেই বসবাস করতেছি; এই যে তুমি আমাকে দেখতেছো, সেইটাকে তুমি বর্তমান বলে মনে করে আরেকটা কাল আবিষ্কার করে ফেলেছো বলে মনে করতেছো, সেইটা আসলে অতীত, কারণ, আলো আমার উপর প্রতিফলিত হয়ে তোমার চোখের মাঝ দিয়ে ব্রেইনে যাচ্ছে, ব্রেইন সেটা তিন ভাগে প্রসেস করে তোমাকে একসাথে যখন একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি দেখাচ্ছে ততক্ষণে সেটা অতীত হয়ে যাচ্ছে; এই বিষয়টি প্রমানীত।

ইঞ্জিনিয়ার বললো,

-বুঝলাম আমরা যা দেখতেছি সবই অতীত কিন্তু সেইটা তো আমাগো ব্রেইনের দুর্বলতা, সময়ের দুর্বলতা তো আর না; একই সময়ে তিন কালের অবস্থান মানে তো সবই একটা কম্পিউটার প্রোগ্রামের মধ্যে রেকর্ড করা, এইটা সম্ভব কি ভাবে, তাইলে আমরা কারা।

সঞ্চালক বললেন,

-সবই ভুল, সবই ভ্রম ডিম্বার মিস্তরি, কোয়ান্টাম মেকানিক্স আজ থেকে প্রায় একশ বছরেরও আগে তাত্ত্বিক ভাবে প্রমান করে এসেছে যে, আমাদের অস্তিত্বটাই একটা প্রবাবিলিটি।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-দিলেন তো আরেকটা মাথা নষ্ট করা থিয়োরী; কোয়ান্টাম মেকানিক্সের থিয়োরী অনুযায়ী তো, একই সময়ে একটি বস্তু আছে আবার নাইও; আমরা একই সময়ে জীবিতও থাকতে পারি আবার মৃতও থাকতে পারি; এই থিয়োরীকে আবার পদার্থের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ ইলেক্ট্রন, প্রোটন, নিউট্রন এবং আলোর ক্ষুদ্রাংশ ফোটন দিয়ে প্রমান করা হয়েছে যে, পদার্থের এই ক্ষুদ্র অংশ গুলো তখনই দৃশ্যমান হয় যখন তাকে শনাক্ত করা হয়; অর্থাৎ, যদি তাদের কে দেখা হয় তবে তাদেরকে আমরা যেখানে দেখতে চাইছি সেখানে থাকবে নয়তো তারা নাই; থিয়োরী অব প্রবাবিলিটির মূল নক্সা বদল করে দিয়েছে এই থিয়োরী; আপনি দেখলে সব কিছুই ১০০% আছে আর যখনই চোখ সরিয়ে নেবেন সব কিছুই ১০০% নাই।

সঞ্চালক বললেন,

-আমরা তো ঐ সব ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কনারই একটি সমন্বিত পৃথিবীতে বাস করছি এবং ফোটনের মূল সমষ্টি আলোর জন্যই তো আমাদের রেইন আমাদেরকে এই পৃথিবীকে দেখাচ্ছে; এখন বুঝে নিন ম্যাজিকটা; আপনার দিকে যদি আমি না তাকাই তাহলে আপনার অস্তিত্ব নাই; আর যদি তাকাই তবেই আপনি আছেন; আপনার অস্তিত্বের জানান দেবার জন্য হলেও অন্য কাউকে আপনাকে দেখতে হবে।

ক্যামেরাম্যান আর সঞ্চালক কি বলে চলেছেন সেটা ওনারাই ভাল বলতে পারবেন; মুক্তিকে দেখে মনে হল, সে কিছু বুঝুক আর নাই বুঝুক, অক্ষুণ্ণ মনোযোগ নিয়ে শুনে চলেছে সঞ্চালকের কথা। সঞ্চালক বলে চলেছেন,  
-সময়ের বিষয়ে আগেই তো বললাম, এপোলো ১০ প্রমানই করেছে, তার ঘড়ির কাটার চেয়ে পৃথিবীর ঘড়ির কাটা এগিয়ে ছিল, অথচ সেই রকেটের গতি ছিল আলোর গতির তুলনায় নাম মাত্র ঘন্টায় ২৫০০০ মাইল; আর ত্বরগত ভাবে বলা হয়, আমরা একটা সময়ের টিউবে আছি, সুতরাং, সঠিক টেকনোলজি জানা থাকলে, ইচ্ছে করলেই সময় নামের টিউবের যে কোন যায়গায় পৌঁছানো সম্ভব।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-নাহ ভাই, অনেকে মনে করে সময়ের টিউবে আছি, কেউ মনে করে সমতল ক্ষেত্রে আছি আবার কেউ মনে করে একটি গোলাকার বস্তুর মাঝে আছি।

সঞ্চালক বললেন,

-সেটা মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে মনে করা হয়; মাত্র কয়েকশো বছর আগেও তো মানুষ মনে করতো সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে; সেটাতে তো আর সত্য নষ্ট হয়ে যায়নি; তবে আমি মনে করি, আমাদের মহাবিশ্ব একটা বৃত্তের মাঝে আবদ্ধ, আমার ভাবনার কারণটা খুব সহজ, যেহেতু মহাবিশ্বের স্থিতাবস্থা নির্ভর করেছে ঘূর্ণনের এবং মধ্যাকর্ষণ শক্তির উপর এবং এই দু'টো শক্তির মাধ্যমে পুরো মহাবিশ্বের গ্রহ নক্ষত্র থেকে শুরু করে সকল বস্তু একে অপরকে ব্যালেন্স করেছে, সুতরাং, সৃষ্টির মৌলিকত্বই গোলাকার, তবে হয়তো সেটা কমলা লেবুর মত ওপরে-নীচে চ্যাপটা বা ডিমের মত একটু লম্বাটেও হতে পারে।

ইঞ্জিনিয়ার গজগজ কর করতে বললো,

-আরে কি জ্বালা, কমলা লেবু, ডিম দিয়া সময়ে ডিফাইন কইরা আমার সময়টা নষ্ট করতেছে, লগে আমার মাথাটাও।

সঞ্চালক বললেন,

-ইঞ্জিনিয়ার, ইঞ্জিনিয়ারিং তো পাশ করছো, আমরা বলতো, আমাদের মহাবিশ্বের বয়স কত।

ইঞ্জিনিয়ার বললো,

-আরে মিয়া আমার এতো সময় আছেনি কার বয়স কতো এইসব মনে রাখার; নিজের বয়সই মনে রাখতে পারি না আবার মহাবিশ্ব, তবে যতটুকু মনে পরে, ১৩.৭ বিলিয়ন বছর।

সঞ্চালক বললেন,

-ঐ তো আধা সঠিক উত্তর দিলা, তোমার সবই আসলে আধা; ইঞ্জিনিয়ারিং পুরা পাশ দিছিলো তো, নাকি ঐটাও আধা।

ইঞ্জিনিয়ার আবার দাঁড়িয়ে পরলো, বললো,

-আমি বিদ্রোহী হয়ে যাবো, আমি এইবার ঢাকাতেই চইলা যাবো।

সঞ্চালক বললো,

-এই স্ত্রীনের দীঘি পার হইয়া বিদ্রোহী হইয়া অতদূর যাইবা কেমনে ইঞ্জিনিয়ার; বসো।

ইঞ্জিনিয়ারও সুবোধ বালকের মত বসে পরলো। সঞ্চালক বললেন,

-যাক, আসল কথা হলো, পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী টেলিস্কোপ দিয়ে আমরা যতটুকু দেখতে পাই, সেই দেখার উপর ভিত্তি করে মহাবিশ্বের সৃষ্টির বয়স বলা হয় ১৩.৭ বিলিয়ন বছর; এর পরের কিছু আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি না, সুতরাং, মহাবিশ্বের শেষ প্রান্তে তো আমরা পৌঁছাতেই পারি নাই; বর্তমান টেকনোলজির মাধ্যমে দৃশ্যমান মহাবিশ্বের পরে আর কোন মহাবিশ্ব আছে কিনা সেটাও আমরা জানি না; তবে আমি বিশ্বাস করি অন্তত আরো সাতটি মহাবিশ্ব বা ইউনিভার্স আছে; আমার এই বিশ্বাসের ভিত্তি নিয়ে এখানে আলাপ করলে অনেক লম্বা আলাপ হয়ে যাবে।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-সেদিন এক লেখা পড়ে রিতিমত ভীমড়ি খাবার যোগাড়; আমাদের এই মহাবিশ্বেই আছে একশো বিলিয়নের উপর গ্যালাক্সি আর প্রতিটি গ্যালাক্সিতে নক্ষত্র আছে কম বেশী এক'শো বিলিয়ন; এই হিসেব কিন্তু নিরেট হিসেব নয়, ধারণা মাত্র, আরো অনেক বেশি হবার সম্ভাবনা আছে; বিশালতাটা অনুভব করেছেন।

সঞ্চালক বললেন,

-এই মহাবিশ্বের বিশালতা আপনি অনুভবে আনতে চাচ্ছেন অথচ সৃষ্টিকর্তার আরো এক বিস্মকর সৃষ্টি মানুষের ব্রেইন নিয়ে একটু চিন্তা করেন; এই যে ব্রেইনের বিভিন্ন তথ্য প্রসেস করে আপনি ব্রেইনের মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত দেয়ার কথা বলছিলেন, সেই কাজের জন্য ব্রেইনে কতগুলো নিউরন ব্যবহার করে বলে মনে করেন; একে অপরের সাথে স্কুলিংগের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য প্রসেস করে মুহূর্তের মাঝে আপনাকে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিচ্ছে, ব্রেইনের সেই নিউরনের সংখ্যা কমপক্ষে এক'শো বিলিয়ন, ব্রেইনের এরি প্রসেসিং ক্ষমতার সাথে যুক্ত আছে নিউরনের আরো দশগুণ গ্লিয়াল সেল, এই তথ্যটুকুও নিশ্চিত নয় বরং আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা অনুযায়ী একটা ধারণা মূলক হিসেব, সংখ্যাটি আরও অনেক গুণ বেশীই হবে।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-আপনার কাছ থেকে আমার নিজস্ব একটা ভাবনা নিশ্চিত করতে চাইছি; আমাদের এই মহাবিশ্বে আমাদের ছাড়া কোন বুদ্ধিমান প্রানের অস্তিত্ব কি পাওয়া সম্ভব বলে আপনি মনে করেন।

সঞ্চালক বললেন,

-অবশ্যই সম্ভব, তবে আমাদের বিজ্ঞানীরা যে ভাবে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন আর পানির মাধ্যমে প্রানের অস্তিত্ব খুঁজে বেড়াচ্ছেন, সেভাবে কখনোই প্রানের অস্তিত্ব এই মহাবিশ্বে তারা খুঁজে পাবেন না বলেই আমি বিশ্বাস করি; ঐ বুদ্ধিমান প্রানীরা হয়তো অক্সিজেন বা পানির ওপর নির্ভরশীল না; আর প্রান যে অবিদ্যমান এবং সেটা যে এক মহাবিশ্ব থেকে অন্য মহাবিশ্বে স্থানান্তরিত হতে পারে সেটাও আমি বিশ্বাস করি; এমনকি ইউএফও নিয়ে এতো যে তুলকালাম কান্ড, সেটাও তো আমাদের পৃথিবীতে অন্য জগতের অতি বুদ্ধিমান প্রানীর আগমন হিসেবে ধরে নিতে পারেন।

ইঞ্জিনিয়ার চোখ বন্ধ অবস্থাতেই কাঁদোকাঁদো গলায় বললেন,

-ভাইয়েরা, এইসব কথা বার্তা এই জ্বীনের দীঘির পারে বইয়া না করলে হয় না।

সঞ্চালক বললেন,

-এই বুইড়া বয়সে এতো জ্বীন-ভুতের ভয় কিভাবে থাকে বুঝলাম না; আচ্ছা ঠিক আছে, আমাদের গল্প আজ এখানেই শেষ করি, ফেরার পথ ধরি।

মুক্তি ভাতিজা বললো,

-কাকা, আর একটু বাসি; আপনি যে টেলিপোর্টেশনের কথা বললেন, সেটা যদি সম্ভব হয় তাহলে তো টেলিপ্যাথিও সম্ভব।

সঞ্চালক বললেন,

-একটা বিষয় প্রমানীত যে, একটি ঘরের মধ্যে বসে থাকা অবস্থায় ৫০০ মাইল দূরের কোন যায়গার বর্তমান বা ভবিষ্যত অথবা অতীত দেখে আসা একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব; টেলিপ্যাথি এবং এক যায়গায় বসে দূরবর্তী কিছু দেখে আসার বিষয়টা হল সাইকোলজিকাল ফেনোমেনা এবং প্রমানীত সত্য।

ক্যামেরাম্যান এক ঝলক ইঞ্জিনিয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখে বললেন,  
-ইঞ্জিনিয়ারতো মনে হয় আবার ঘুমিয়ে পরেছে, এই সুযোগে আপনার ইবলিশের গল্পটা সেরে ফেলেন।  
সঞ্চালক বললেন, আসলে ওটা তেমন কিছু না, ইঞ্জিনিয়ারকে ভয় দেখানোর জন্য একটা অস্ত্র।

ইঞ্জিনিয়ার আমাদের জানান দেয়ার জন্য খুক খুক করে কাসি দিয়ে বললেন,  
-ঘুমাই নাই ঘুমাই নাই, ঝিমাইতেছি; আমারে ভয় দেখানির অস্ত্র যখন, বলো বলো, দেখি সেই অস্ত্র প্রানঘাতি  
কিনা।

সঞ্চালক বললেন,

-দেইখো, একবার তো মাজা ব্যাঁকা কইরা ফেলাইছিলো, ভাতিজা নিয়া গেল বইলা বেঁচে গেছো, এইবার ভাতিজা  
কিন্ত আর নিতে পারবে না, হয় একা যাইবা নাইলে প্যান্টের ভিতরেই, হুহু।

ইঞ্জিনিয়ার চোখ বন্ধ রেখেই বললেন,

-আমারে হুহু শুনাইলা, বাগে ভালোই পাইছো, এই আমি বইলাম গাইড়া, তোমার স্ত্রীনের গল্প শোনাও, দেখি  
আমার কি করতে পারো।

সঞ্চালক বললেন,

-কইলাম কিন্ত।

ইঞ্জিনিয়ার চোখ না খুলেই মাথা ঝাঁকিয়ে, গল্পের খোড়াই কেয়ার করেন এমন ভাব নিয়ে বললেন,  
-এতোক্ষণ তো স্ত্রীন ভূত বহুত কিছু শুনাইলা; আমি এখন একখান বাঘের গল্প শুনাই, বাঘ আর রাখালের গল্প  
শুনছো তো।

সঞ্চালক বললেন,

-ঐসব পুরানা গল্প শুনাইয়া আসরটারে নষ্ট না করলে হয় না ইঞ্জিনিয়ার; রাখাল প্রতিদিন বাঘ আসছে বাঘ বাঘ  
করে চিৎকার জুড়ে দেয়, গ্রামবাসী লাঠিসোঁটা হাতে দৌড়ে এসে দেখে বাঘটা কিছু নেই, রাখালের বিটলামী সব,  
গ্রামবাসী রাগ করে চলে যায় আর রাখাল ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে; এরপর একদিন সত্যিই যখন বাঘ এসে  
রাখালকে ধাওয়া দিল তখন রাখালের অনেক বাঘ বাঘ চিৎকারেও গ্রামবাসী এগিয়ে এলো না, বাঘও রাখালকে  
খেয়ে ফেললো; এই গল্পই তো।

ইঞ্জিনিয়ার বললো,

-হ, হ, বাঘ রাখালের গল্প এইটাই কিন্ত আমি শুনাইতে চাই কাগুজে বাঘের গল্প।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-সেইটা আবার কোন গল্প।

ইঞ্জিনিয়ারও খুব স্ত্রানী স্ত্রানী ভঙ্গীতে বললেন,

-তারমানে কেউ শোনে নাই; শোনে তাইলে, রাখাল আর বাঘের গল্পে তো বাঘ যখন সত্যিই আইলো তখন  
গ্রামবাসী শ্যাম পর্যন্ত রাখালেরে বাঁচাইতে আইলো না, আর কাগুজে বাঘের গল্পে বাঘই আর শরমাইয়া আসে নাই;  
কিছু কিছু খবরের কাগজ কই থেইক্কা যে সংবাদ সংগ্রহ করে আল্লায় জানে, দুইদিন পরপর খালি কয় আম্মুকে  
আইজই বাঘ হইয়া যাইতেছে, কইলই বাঘ হইয়া যাইতেছে, অবশেষে এমন একদিন আইলো, শরমে বাঘ হওয়ার  
সম্ভবনাই গেল শ্যাম হইয়া, বাঘ হইয়া গেল মানুষ; তোমার স্ত্রীন দেইখো শ্যাম পর্যন্ত মানুষ হইয়া যাইবো।

এইটুকু বলে ইঞ্জিনিয়ার মুখের ওপরে থাকা কঞ্চলটা আরো সামনে নিয়ে এসে মুখটা একেবারে প্রায় ঢেকে নিলেন।

8

সঞ্চালক ঠিকই ইঞ্জিনিয়ারের কঞ্চল মুড়ি দেয়া দেখে মুচকি একটা হাসি দিয়ে শুরু করলেন,



-হাতে তালি দেওয়ার ইচ্ছা করতেছে, মিস্ত্রিও এখন গল্প বলে; যাক, ইবলিশের কথা বলতে হলেই চলে আসে “ফ্রী উইল”, চলে আসে “প্রান” এর সংজ্ঞার কথা; টেলিপোর্টেশন, টাইম মেশিন, এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে রূপান্তরের ক্ষমতা বিজ্ঞানীরা আসলেই মানুষের হাতে তুলে দিতে পারলেও কতদিন পরে পারবেন, তার উত্তর আমার বিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল নয়; তবে বস্তুর রূপান্তর সম্ভব এবং তৎসংগত ভাবে এটাও প্রমাণিত যে, সময়ের বাধা ডিঙ্গানো সম্ভব; যার এসব যদি সম্ভব হয়ে থাকে তবে আমাদের সব কিছুই, সব “কাল”ই একটি নির্দিষ্ট ফ্রেমে আবদ্ধ, যেটাকে টাইম টানেল বলা হচ্ছে; তাহলে তো একটা বিষয় নিশ্চিত যে, আমাদের বর্তমান বা অতীতের কর্মের কারনের ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল নয়; তাহলে ফ্রী উইলের মানে কি? তাহলে প্রানের উৎস কি?

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-একটা কথা আছে, জীবনকে খুঁজতে হলে মৃত্যুকে খুঁজে বের করতে হবে। মৃত্যু মানে কি? জীবন এক অবিদ্যমান বিষয় যদি না হয়ে থাকে তবে জীবনাবসানের পর দেহ কেন নশ্বর হয়ে যাবে, মাটির সাথে মিশে যাবে; এ যেন, আমাদের শুরু হয়েছিল মাটি-পানি দিয়ে, আবার সেই মাটি আর পানির কাছেই ফিরিয়ে দেয়া হল; তাহলে মাঝখান থেকে অবিদ্যমান প্রান কোথায় গেল?

আমি বললাম,

-আপনাদের কথায় কিন্তু আমার একটা উপলব্ধি হচ্ছে, বললে আবার হাসবেন না তো।

সকলের সিরিয়াস ভঙ্গী দেখে বুঝলাম যে, তারা এসব আলাপের সময় হাসির কথা ভুলে যান, আমিও সাহস সঞ্চয় করে বললাম,

-সঞ্চালক সাহেব যে বললেন, আমাদের ব্রেইন কমপক্ষে ট্রিলিয়ন নিউরন ও গ্লিয়াল সেলের মাধ্যমে আমাদের বোধ থেকে শুরু করে সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাহলে আমরা যা খাচ্ছি সেটা শুধুই মাটি ও পানির তৈরী হতেই পারে এবং সবচেয়ে মজার উপলব্ধি যেটা হচ্ছে, সেটা হল, আমাদের শরীর নির্গত বর্জ্যও কিন্তু মাটি ও পানিই; আমাদের ব্রেইন শুধু স্বাদ, গন্ধ আলাদা করে দিয়ে আমাদের কাছে বিভিন্ন ধরনের বস্তু এনে হাজির করছে।

সঞ্চালক বললেন,

-এখানে হাসির কথা কিছু বলেননি আপনি; যেহেতু বস্তুর কাঠামোগত পরিবর্তন এনে, এক বস্তুকে অন্য বস্তুতে রূপান্তর সম্ভব বলে মানুষই প্রমাণ করেছে, সুতরাং, আপনার উপলব্ধি একেবারে সঠিক; তবে আপনার এই উপলব্ধির সূত্রের সাথে আমি একটু যোগ করতে চাই, সেটা হল, মাটি এবং পানির মাঝে আরো কিছু বিষয় ঢোকানো হয় মাটি ও পানির মাঝে বস্তুগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে, যাকে আমরা ভিটামিন, আয়রন, স্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্যামিক্যালের ভাগ করেছি, সেই পরিবর্তনের কারণে ব্রেইন বিভিন্ন স্বাদ-গন্ধ-প্রয়োজনীয়তা আলাদা করে দেয় আমাদের।

সঞ্চালকের সাথে কথা বলতে বসলেই নিজেকে জ্ঞানী জ্ঞানী মনে হয়। এমন ভাবে ভাবনার দূয়ার খুলে দেবার ব্যবস্থা করেন যে, মনে হয়, বিষয়টি আমার মাথা থেকেই বের হচ্ছে। তবে মাঝেমাঝে মনে হয়, এইসব আজগুবি প্যাঁচালের মাঝে থাকলে জ্ঞানের কোন পরিধি বাড়ে না, বেড়ে যায় আজগুবি চিন্তা করার স্বাধীনতা, আজগুবি কথা বলার স্বাধীনতা। সঞ্চালকের চিন্তা জগতের বসবাস আসলে সব কিছু সম্ভবের দেশে। একারণেই এই ধরনের মানুষের সাথে বেশীক্ষণ গল্প করা উচিত না, কারণ, মানুষের ভাবনার জগতের স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে ঠিক কিন্তু অতিরিক্ত স্বাধীনতা সৃষ্টি জগতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বসতে পারে। ক্যামেরাম্যান বললেন,

-তাহলে কি আপনি বলতে চাইছেন, ব্রেইনের কার্যক্রমই প্রান।

সঞ্চালক বললেন,

-এতো সহজিকরন করলে হবে ক্যামেরাম্যান? টেলিপোর্টেসনে প্রানীকে টেলিপোর্ট করতে হলে তো ব্রেইনকেও ভেঙ্গে দিয়ে রিকনস্ট্রাক্ট করতে হবে, তাহলে হয় প্রানীর টেলিপোর্টেশন কখনোই সম্ভব নয় বলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে নতুবা প্রানের ডেফিনেশন অন্য কিছু; তাছাড়া ক্লোনিং আর জিন ম্যাপিং করে তো প্রানের ডেফিনেশন একেবারেই আউলা ঝাউলা করে দিয়েছে; তারপর আছে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ভেজাইল্লা পর্যবেক্ষন।

ইঞ্জিনিয়ার কন্মল ফাঁক করে মুখ সামান্য বের করে বললেন,

-মিয়া ভাইয়েরা, আমি কিছু ভয়ের গল্প শুইনা মজা নিতে চাইছিলাম দেইখা কন্মল মুড়ি দিয়া বইছিলাম; কিসের কি, ভয়ের গল্প গায়েব, শুরু করছেন আজগুবি বর্জ্য পদার্থের গল্প; বহুত থিয়োরী মারছেন, আমার একটা থিয়োরী শুইল্লা রাখেন সবাই, কিছু কিছু বিষয়ে আলোচনা করায় টাবু থাকা উচিত, সেই বিষয়ে আলাপ নিষিদ্ধ করা উচিত।

ক্যামেরাম্যান ইঞ্জিনিয়ারের কথায় মনে হলে একটু নাখোশই হয়েছেন, বললেন,

-আপনার কথা মানতে পারলাম না; মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে, সেটাই মানুষের ফ্রি উইল, সেই ফ্রি উইল দিয়েই মানুষ আজ জ্ঞান বিজ্ঞানে এতদূর এসেছে।

সঞ্চালক বললেন,

-আমরা আসলে টেলিভিশনের টক শো'য়ের মত কথা বলা শুরু করেছি; যে বিষয়ে আমরা তর্ক করছি সেই বিষয়ের সমাধান আমাদের দেবার ক্ষমতা নেই, আর কোন দৈব কারণে যদি সমাধান দিয়েই বসি, তাহলেও আমাদের সমাধানটুকু সেই মহামানবদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করাতে পারার ক্ষমতা রাখি না যেখানে গেলে আমাদের সমাধান থেকে মানব কল্যাণে কোন ভূমিকা রাখার মত ব্যবস্থা নেয়া যায়।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-মানলাম ইঞ্জিনিয়ারের কথা; তারপরও শুরু যখন করেছেন তখন প্রানের উৎস সম্পর্কিত আপনার ভাবনার একটা শেষ টেনে দিয়ে যান।

সঞ্চালক বললেন,

-আমার কনক্লুশন শুনতে চাইছেন যখন তখন বলতে আমার আপত্তি নাই, তবে ভাইয়ের মতই বলি, আমার কনক্লুশন শুনে আবার হাইসেন না।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

-অন্য মানুষেরে গর্দভের অধম, অসামাজিক কইতে বাধা নাই, খালি নিজের কথা শুইল্লা অন্য কেউ হাসলেও দোষ।

সঞ্চালক বললেন,

-নাহ, ইঞ্জিনিয়ার হাসলে দোষের কিছু নাই, কারণ, কোন হাসির কথা শোনার পর গাধারা নাকি কমপক্ষে তিনবার হাসে, একবার হাসে, কারণ মজার একটা গল্প বলা হয়েছে তাই হাসতে হবে, মানে না বুইঝাই হাসি; একবার শোনার পর অন্য সবাই হেসেছে দেখে হাসি, আরেকবার বুইঝাই হাসি। ইঞ্জিনিয়ারের হাসিটা প্রথমবারের হাসিই ধরে নেবো।

ইঞ্জিনিয়ার কন্মল ফেলে উঠে দাঁড়ালো,

-এই যে দেখেন দেখেন, আমারে আবার গাধা কইলো, আপনারা বোঝেন নাই কিন্তু আমি বুঝছি।

সঞ্চালক বললেন,

-নারে বাবা, তোমারে গাধা কই নাই, পাগলও কই নাই, তুমি কন্মল মুড়ি দিয়া বস, প্রানের গল্প শেষ কইরাই ভয়ের গল্প বলবো।

ইঞ্জিনিয়ার সুবোধ বালকের মত আবার তাড়াতাড়ি কন্সল দিয়ে মুখ পেঁচিয়ে বসে পরলেন। সঞ্চালক আবার একটা মুচকি হাসি দিয়ে শুরু করলেন,

-প্রান বিষয়ক আমার কনক্লুসিভ ভাবনা হল, পুরো মহাবিশ্ব বা মাল্টিভার্সও হতে পারে, যেহেতু ঘূর্ণন আর মধ্যাকর্ষণ বলের ভারসাম্যের খেলার কারণে টিকে আছে, সুতরাং, আমাদের প্রানের সংজ্ঞাও সেই ঘূর্ণন এবং মধ্যাকর্ষণ জাতীয় দু'টি শক্তির আমাদের শরীরের মাঝে ভারসাম্যের মাধ্যমে সৃষ্ট কোন অদ্ভুত শক্তির কারণ বলে ধরে নিতে পারি; আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে বা আরও কোন হাস্যকর কথা না বলতে চাইবার কারণে, এই প্রান সংক্রান্ত আলাপ আর এগিয়ে নিয়ে যাই না আমরা।

আমি বললাম,

-ভাই, কারো হাতেই তো ঘড়ি নেই; আমাকে আর মুক্তিকে সকাল আটটায় যেতে হবে, একটু বিছানায় পিঠটা ঠেঁকিয়ে নিতে পারলে ভাল হত।

মুক্তি ভাতিজা অনেঞ্চণ পর কথা বললো,

-কাকা, আর একটু বসি; তাছাড়া আমার গল্পটাও তো শোনানো হয়নি।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-ঠিক আছে, মুক্তির গল্পের পর আড্ডা ভাঙ্গা যায় কিন্তু আপনি দু'টো বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, প্রান, আর ফ্রী উইল। একটার তো কনক্লুশন টানলেন এবার ফ্রী উইলের কনক্লুশন টেনে দিন।

সঞ্চালক বললেন,

-কেন, ফ্রী উইলের কনক্লুশন তো টানাই আছে; আমি বিশ্বাস করি ফ্রী উইল সম্পন্ন প্রানী এই মহাবিশ্বে আমরা ছাড়াও আরো অন্তত একটি প্রজাতি আছে, তবে আমাদের ফ্রী উইলের সীমান্ত টেনে দেয়া আছে সময়ের টানেলের মাঝ দিয়ে; এই সীমান্ত আমরা কখনোই অতিক্রম করতে পারবোনা; টাইম ড্রাভেল করে আমাদের অতীত বা ভবিষ্যৎ দর্শন হয়তো সম্ভব কিন্তু কখনোই সেই কালে যেয়ে তখনকার চলমান ঘটনা প্রবাহে পরিবর্তন আনতে পারবো না; মনে করে নিন অনেকটা সিনেমা হলে বসে মুক্তি দেখার মত; তবে আমাদের একটা গাইড লাইন দেয়া আছে কি করতে হবে এবং কি করা যাবে না; এই দু'টো গাইড লাইন যদি আমরা সঠিক ভাবে পালন করি তবে আমরা সেই টাইম টানেল থেকে নিজেদের মুক্ত করে পরবর্তি মহাবিশ্বে পৌঁছে অসীম জ্ঞানের অনুসন্ধানে নামতে পারবো।

আমার মনে হল সঞ্চালক কিছু একটা গভীর কথা বলেছেন। কিন্তু আমি যে বিষয়ের গভীরতাটুকু ধরতে পারি নাই সেটা অন্য কেউ যাতে বুঝতে না পারে সে জন্য তাড়াতাড়ি মুক্তির দিকে ফিরে বললাম,

-ভাতিজা, তোমার গল্পটা শেষ করে ফেল। মুক্তি আড় চোখে ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললো,

-আমার গল্পেও তো স্বীন ভূত চলে আসতে পারে, তখন অনেকে বাধা দিতে পারেন।

ইঞ্জিনিয়ার যেন ওঁত পেতে ছিলেন। সঞ্চালকের দিকে তাকিয়ে বললেন,

-এই যে, আগেই কইছিলাম না, সকলে মিল্লা ভাতিজাটারেও নষ্ট করতেছে, আমার পিছনে লাগাইতেছে।

মুক্তি বললো,

-না ইঞ্জিনিয়ার কাকা, আমার কাকাকে জিজ্ঞেস করেন, আমার গল্পের অনেক কথাই দুর্বোদ্ধ মনে হওয়ায় সকলে ঐ গল্প গুলোকে স্বীন-ভূতের গল্প বলে।

ইঞ্জিনিয়ারের হাত থেকে ভাতিজাকে বাঁচাবার জন্য আমি তাড়াতাড়ি বললাম,

-তাহলে তো হ'লই। আর যদি কোন কারণে তোমার গল্পে স্বীন-ভূতের কথা চলেই আসে, তখন সে যায়গায় অন্য কোন নাম বললেই হল, যেমন ধর, ভূত জাতি বুঝাতে হলে ভ-জাতি বলবা।

মুক্তি বললো,

-স্বি আচ্ছা কাকা।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

-আরে, এইটা কিছু হইলো, আগেই তো কইয়া দিলেন, এখন ভ-জাতি কইলেই তো আমি বুকুম ভুতের কথা হইতেছে।

সঞ্চালক আর থাকতে পারলেন না, বললেন,

-ঐ ইঞ্জিনিয়ার, ভাল না লাগলে আরেকখান ঘুমের ওষুধ খাইয়া পিছনের ঐ তেরপলের ওপর ঘুমাও গিয়া।

ইঞ্জিনিয়ার আর কোন কথা না বলে, মুখ ঢেকে, কঞ্চল মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি মেরে বসলেন। শুরু হল মুক্তির গল্প।

## **মুক্তির গল্প**

-আমাকে সবাই আজগুবি গল্পের ভান্ডার বলে থাকে; সত্যি বলতে কি আমি আপনাদের মত অত চিন্তা করি না কিংবা আপনাদের মত এতো তাত্ত্বিক বই না পড়লেও প্রাচীন পৃথিবীর ইতিহাস, বহু উপকথা, রূপকথা, বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ সহ বেশ কিছু বই পড়ে নিজের মত করে মানবজাতির ইতিহাস সাজাবার চেষ্টা করে থাকি; একটা মজার বিষয় হল, পৃথিবীর বেশীর ভাগ ধর্ম গ্রন্থই বলেন আর বৈজ্ঞানিক প্রমাণই বলেন, মহাপ্লাবনের কথা বহুবার বহু যায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে; আমার সব সময়ই খটকা লাগতো কাল এবং সময় নিয়ে; বিভিন্ন যায়গার বিভিন্ন রেফারেন্সের সাথে মানব সৃষ্টি রহস্যের সময়ের হিসেবে মেলাতে পারি নাই; আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে, এই সংক্রান্ত রহস্যের সমাধান লুকিয়ে আছে টাইম মেশিনের মাঝে; আজ সারাদিনে আপনাদের আলাপে আমার মনে হল, আসলে মূল প্রতিপাদ্য হিসেব থেকে যদি সময়কে বাদ দিয়ে আগাই, তাহলে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ বছরের হিসেবের খাতায় হাজার বৎসরের হিসেবের গোলমালও কোন বিষয়ই না; আর ডারউইনের তত্ত্বকে আমার সবসময়ই মনে হয়েছে অসার এবং মানবিক বোধহীন তত্ত্ব; এইসব বড় বড় তাত্ত্বিকেরা যদি অদ্ভুত তত্ত্ব ঝাড়েতে পারেন, তাহলে আমার মত নির্বোধেরা যদি দুই একটা অদ্ভুত তত্ত্ব ঝাড়ে তাতে অসুবিধা কোথায়; আমার তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রথমেই আগে আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, একক সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন এবং তিনি নির্ধারিত নিয়মে বিশ্ব ব্রহ্মান্দ পরিচালনা করছেন।

সঞ্চালক মুক্তিকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,

-তুমি এতো বড় ভূমিকা দিচ্ছো কেন; আমাদের আলোচনার কোন যায়গায় কি তুমি পেয়েছো যে, আমরা একজন আরেকজনের মতকে বাতিল করে দিচ্ছি।

ইঞ্জিনিয়ার ফোরন কেটে বসলো,

-হ,হ, নিজে যখন ঘন্টার পর ঘন্টা স্তান ঝাড়ে তখন যে আমরা চুপ কইরা বইয়া থাকি, সেই সময় আমাগো কেমন লাগে বুইঝা লও এখন।

আমাদের ক্লাবের নব্য সভ্য ভাতিজা মুক্তি যাতে সঞ্চালক আর ইঞ্জিনিয়ারের প্যাঁচালের মধ্যে গিয়ে তার কথার খেই না হারিয়ে ফেলে, তাই তাদের কথার মাঝে ঢুকে পরে বললাম,

-আমাদের স্তানের পরিধি এতোটাই সীমাবদ্ধ যে, আমরা বলতেই পারিনা কোনটা সত্যিকারের সঠিক বিষয়; এমনকি পৃথিবীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা আজকের যুগে এসেও বলতে পারে না যে, তারা যা বলছে সেটাই সঠিক; স্টিফেন হকিং তো প্রায় প্রতিদিনই তার আগের তত্ত্বকে বাতিল করে নতুন তত্ত্ব নিয়ে হাজির হতেন।

হাহাহা করে হেসে উঠে সঞ্চালক বললেন,

-CMLT, মানে, ক্যাম্বেল মাই লাস্ট থিয়োরী; ভাতিজা, তুমি কারো কথায় কান না দিয়ে তোমার থিয়োরীটা বলে ফেলো, দেখা যাক তোমাকে আমাদের ক্লাবের পূর্ণাঙ্গ সদস্য করা যায় কিনা।

মুক্তি কিছুটা ঘাবড়ে গিয়ে বললো, কাকা,

-আপনাদের আজগুবি ভাবনাই বলেন অথবা তথ্য-প্রমাণ সহ ভাবনাই বলেন, আমার খুব ভাল লেগেছে; এখন যদি আপনাদের ভাবনা ক্লাবে ঢোকান জন্য পরীক্ষা নেয়ার কথা বলেন তবে তো আর গুছিয়ে কথাই বলতে পারবো না।

ইঞ্জিনিয়ার বললো,

-ভাতিজা এইসব লোকজনের কথায় তুমি ঘাবড়াইওনা, এরা তোমারে কি সদস্য করবো; আমার অফিসে ক্লাবের নিয়মিত সভা বসে, তারমানে ক্লাবের আমিই সভাপতি, আমি তোমার পার্মানেন্ট সদস্যপদ দিয়া দিলাম।

সঞ্চালক বললেন,

-যদিও এটাকে স্বৈরাতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত বলতে হচ্ছে, তারপরও ভাতিজার ক্ষেত্রে মেনে নিলাম, বলা ভাতিজা, তোমার কথা বল।

মুক্তি বললো,

-কাকা, গল্পটা বলার সময় আমরা থামাইলে সব গোলমাল হয়ে যাবে; আমি যদিও অনেক আগে থেকে চেষ্টা করতছি আমার নিজস্ব তত্ত্ব দিয়ে মানব জাতির ইতিহাস মিলাবার কিন্তু আপনাদের কথা গুলো শোনার পর একটা যায়গায় পৌঁছাবার জন্য এই মুহুর্তে আমার ভাবনা গুলোকে এই প্রথমবারে মত গোছানোর চেষ্টায় আছি।

ইঞ্জিনিয়ারের নিজেকে ক্লাবের সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করাটাকে স্বৈরাচারী কর্মকান্ড বললেও, সঞ্চালক মেনে নেয়ায় এবং ক্লাবের অন্য সকলের নিরবতায় নিজেকে ক্ষমতাবান ভেবে গায়ের কঞ্চল ফেলে দিয়ে হাতের আঙ্গিন গুটিয়ে বললেন,

-ভাতিজা, আমি পাহাড়ায় বইলাম, তুমি যদি এই স্ত্রীনের দীঘির পারে বইয়া সরাসরি স্ত্রীন-ভুত লইয়া কোন কথা না কও, তাইলে তোমার কথায় কেউ বাধা দিলে লগে লগে তারে ক্লাব খেইক্লা বহিস্কার। কও তুমি।

মুক্তিও মনে হল ভরসা পেলো ইঞ্জিনিয়ারের কথায়, বলা শুরু করলো,

-আমি মানব সভ্যতার ইতিহাস মেলাতে চাইতেছি; তথাকথিত আনুনািকির ইতিহাসকে আমি মানব সভ্যতার অংশ ধরবোনা; ওটা নিয়ে আমার মতামত পরে বলছি; সঞ্চালক কাকা বলেছেন, প্রতি দশ-বারো হাজার বছর পরপর পৃথিবীর চৌম্বকীয় মেরু বা ম্যাগনেটিক পোল পরিবর্তিত হয়ে থাকে; কাকা কিছু মনে করবেন না, এটা কিন্তু অনেকেই বলে এক লক্ষ বছর, অনেকে বলে সাত লক্ষ বছর পরপর হয়; তবে আপনার হিসেব আমার কাছে বেশি গ্রহনযোগ্য মনে হয়েছে বলে আপনার তত্ত্বের কাছাকাছি বারো হাজার বছর পরপর পৃথিবীর চৌম্বকীয় মেরু পরিবর্তিত হয় ধরে নিয়ে আমার গল্পটা বলার চেষ্টা করি; সেই হিসেবে আজ থেকে প্রায় চব্বিশ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে শেষ বরফ যুগ এসেছিল; এরপর আজ থেকে প্রায় প্রায় বারো হাজার বছর আগে আবার মেরু পরিবর্তনের কারণে বরফ গলে এক মহা প্লাবন তৈরী হয়ে পৃথিবীর বর্তমান রূপের কাছাকাছি একটা স্ট্রাকচার দাঁড়ায়; কিন্তু আমার মতে ঐ মহাপ্লাবনটি এতটাই ব্যাপক ছিল যে, শুধু মেরু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীতে যতটুকু আবহাওয়া পরিবর্তন হওয়া উচিত বা সম্ভব বলে ধরে নেয়া যায়, সেই একটা কারণেই এতো বড় মহাপ্লাবন ঘটেছিল বলে ভাববার কোন কারণ নেই।

এটুকু বলে মুক্তি তার পাহাড়াদার ইঞ্জিনিয়ারের দিকে এক মলক তাকিয়ে আবার বলা শুরু করলো,

-আমার গল্পটিকে এবার একটু অন্যদিকে গোতা খাওয়াই; সৃষ্টিকর্তা মানব জাতি তৈরী করার আগেই স্বজাতি নামের আরেকটি প্রজাতি সৃষ্টি করেছিলেন; তাদের মূল বাসস্থান ছিল আমাদের মহাবিশ্বেই শুধু নয় আমাদের গ্যালাক্সিরই আরেকটি নক্ষত্রের কক্ষপথে থাকা নিবিরু নামের এক গ্রহে; এই গ্রহটির একটি বৈশিষ্ট হল, গ্রহটি অদ্ভুত এক কক্ষপথে চলা ফেরা করে, তার নিজের সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা ছাড়াও আমাদের সূর্যের মধ্যাকর্ষণ টানে পৃথিবীর কক্ষপথের কাছে এসে পরে প্রতি প্রায় চার হাজার বছর পরপর; এই গ্রহটি যখন পৃথিবীর কক্ষপথের কাছে এসে পৌঁছে যায়, তখন আমাদের সূর্যের মধ্যাকর্ষণের টানে পৃথিবী কে ঘিরে একটা চক্রর খেয়ে, আবার তার নিজের সূর্যের কক্ষপথে ফিরে যায়, যে কারণে গ্রহটির কক্ষপথ আমাদের মত গোলাকার না হয়ে একটা অদ্ভুত আকৃতির হয়।

মুক্তির গল্প চলছে,

-এই নিবিরু গ্রহের সেই স্বজাতি পৃথিবীর সময়ের হিসেবে আজ থেকে বারো হাজার বছর আগেই জ্ঞানে বিজ্ঞানে বিপুল উন্নতি করেছিল, যেটা আমাদের বর্তমান বিজ্ঞানের তুলনাতেও অনেক বেশী; তাদের সমস্যা ছিল একটাই, সৃষ্টিকর্তা তাদেরকে সঠিক পথ দেখাবার জন্য তাদের কাছে কোন মহামানবকে পাঠাতেন না; সে কারণে তারা শুধুই যে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকতো সেটা নয়, তারা সৃষ্টিকর্তার কথাও স্মরণে না রাখায় তাদের

মাঝে বিশাল বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখা দিয়েছিল; এই স্বজাতির মাঝে একজন ছিল যার নাম ধরে নেই আজাজিল, এই আজাজিল সৃষ্টিকর্তায় অবিশ্বাসী স্বজাতির মাঝে থেকেও একক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করতো; আজাজিলই প্রথমবারের মত স্বজাতিদের বিশৃঙ্খলা দূর করলেও অন্তত দুটি ভাগ থেকে গিয়েছিল, যার একটি ভাগ সম্পূর্ণ ভাবে আজাজিলের অনুগত, অন্যদিকে আরেকটি গ্রুপ ছিল আজাজিল বিরোধী।

আমরা বেশ গভীর মনযোগের সাথে মুক্তির গল্প শুনছি, প্রায় বারো হাজার বছর আগে স্বজাতির মূল বাসস্থান নিবির্ক গ্রহটি যখন পৃথিবীর কাছে এলো, তখন পৃথিবীর বুকে চলছে মেরু পরিবর্তনের সময়; এক চাঁদের কারণে আমাদের পৃথিবীতে যে জোয়ার-ভাটা হয় তার সাথে যোগ করেন নিবির্কর টান; বিশাল এক মহা প্লাবন তৈরী হল পৃথিবীর বুকে; নিবির্কর অধিবাসি স্বজাতি ছিল অদ্ভুত এক পদার্থ দিয়ে তৈরী, যে কারণে নিবির্কর মত আগুনের মত উত্তপ্ত গ্রহতেও তাদের বাস করতে অসুবিধা হত না, আবার পৃথিবীর মত তুলনামূলক ঠান্ডা গ্রহও তাদের বসবাসের জন্য গ্রহন যোগ্য; তারা জলে-স্থলে দুই যায়গাতেই বাস করার মত উপযোগী করে তৈরী এবং শুধু তাই নয়, তারা তাদের আকার-আকৃতি-বাহ্যিক রূপ পরিবর্তনেও পারদর্শী।

স্যাটারডে ক্লাবের নব্য সদস্যের বিশাল গল্প কেউ থামাবার চেষ্টা করছেননা, -নিবির্কর স্বজাতির দুই ভাগের দুটি ভাগই তখন আজাজিলের প্রচারে একক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করা শুরু করলেও, আজাজিলের গ্রুপের বাইরের গ্রুপটি সৃষ্টি কর্তার রহস্য ভেদ করার চেষ্টায় তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানকে নিয়োজিত করেছিল আজ থেকে সেই বারো হাজার বছর আগে; তারা সিদ্ধান্ত নিল, সৃষ্টিকর্তার রহস্য ভেদ করতে হলে স্বজাতির ব্রেইনের রহস্যের সমাধান করতে হবে; আর ব্রেইন সমস্যার সমাধান করতে যেয়ে তারা বুঝলো, এই কাজ করার জন্য যে এনার্জি দরকার হবে, সেই এনার্জি তৈরী করা এবং সেই এনার্জি ব্যবহার করার সময় হঠাৎ কোন দৃষ্টিনায় তাদের বাসস্থান নিবির্কই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, কারণ, ব্রেইন পুনর্গঠনে বিপুল এনার্জি প্রয়োজন; তারা ঠিক করলো, পৃথিবী হতে পারে তাদের গবেষণার স্থান; সেই বারো হাজার বছর আগে তারা পৃথিবীতে এসে দেখলো, মেরু পরিবর্তন এবং নিবির্ক গ্রহের টানে সৃষ্ট মহাপ্লাবন প্রায় শেষ হয়েছে; জোয়ারের টান স্থিতিশীল হবার পর, ত্রিশ অক্ষাংশ বরাবর শুষ্ক স্থান, অর্থাৎ, পানি থেকে ভেসে উঠেছে; তাছাড়া ত্রিশ অক্ষাংশ ছিল তাদের নিবির্ক গ্রহ থেকে এখানে আসবার জন্য সহজ যায়গা; যেমন, পৃথিবী থেকে আমরা চাঁদের এক পিঠ দেখি এবং সেখানেই আমাদের প্রায় সব অভিযান চালিয়ে থাকি, তেমনি নিবির্ক থেকেও ত্রিশ অক্ষাংশ বরাবর অংশটি তাদের গ্রহ থেকে সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত; তারা আরেকটি জিনিষ পৃথিবীতে পেলো, তার নাম সোনা, যেটা ইলেক্ট্রিক্যাল সুপার কন্ডাক্টর হিসেবে এখন সুপরিচিত, যেটাকে এনার্জি পরিবহনে ব্যবহার করা যায়।

হায়রে কপাল, ভাতিজা যে থামছেই না, বর্তমানে যে যায়গাটা এটলান্টিক মহাসাগর, সেটি মহা সাগর ছিলনা, ছিল বর্তমানের ইউরোপ এবং আমেরিকাকে যুক্তকারী বিশাল এক ভূখন্ড "এটলান্টিস", অর্থাৎ, এক বিশাল শুকনো যায়গা; আমি বিশ্বাস করি, আটলান্টিক মহাসাগরের ৩০ অক্ষাংশ এবং ৪৫ ড্রাঘিমাংশ বরাবর খোঁজ করলে এখনো এই মহাদেশীয় ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাবে; কাকা, এটাকে শুধু আমার গল্প ভাববেন না; প্ল্যাটোও কিন্তু এই বিষয়ে বলেছেন; যাইহোক, স্বজাতি শুরু করলো পিরামিড তৈরীর কাজ, আজ থেকে প্রায় বারো হাজার বছর আগে; কেন পিরামিড? আসলে ত্রিশ অক্ষাংশ জুড়ে যে পিরামিডের সারি সাজানো হয়েছিল, সেটা ছিল ব্রেইন সহ স্বজাতির একটি সম্পূর্ণ প্রতিরূপ, কম্পিউটার সিমুলেশন হার্ডওয়্যার; কিছু পিরামিডকে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে ব্রেইনের মত করে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করলো; অন্য পিরামিড গুলো যেন তাদের শরীরের বিভিন্ন অংশ; এক পিরামিড থেকে আরেক পিরামিডে যাবার প্যাসেজ তৈরী করল, যেনো শিরা উপশিরা; বলা চলে, একটি স্বজাতীয় রোবটিক হার্ডওয়্যার সিস্টেম দাঁড় করিয়ে ফেললো।

স্বজাতির আরেকটি সুবিধা হল, তাদের বিশাল আয়ু; এক সময় যখন তারা বুঝলো নিবির্ক তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং আগামী প্রায় চার হাজার বছর তাদের নিবির্কতে ফেরা সম্ভব হবে না, তখন তাদের বেশ কিছু স্বজাতি থেকে গেলো পৃথিবীর বুকে; পিরামিড কেন্দ্রীক সৃষ্টি রহস্যের গবেষণা পৃথিবীর বুকে চলতে থাকলো।

আমি আর থাকতে পারলাম না। বললাম,  
-ভাতিজা, তোমার এই আজগুबी গল্পের শেষ কোথায় সেটা বলবে তো।  
ইঞ্জিনিয়ার সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে বললো,  
-যেহেতু আপনাদের সিলেটে বইসা আছি তাই আপনাকে একটা ওয়ার্নিং দেয়া হইল; আর কাউরে কিন্তু দিমা না,  
ভাতিজার গল্পে বাধা দেওয়ার লগে লগে বহিষ্কার।

ক্যামেরাম্যান বললেন,  
-আমি কিন্তু মজাই পাচ্ছি; বর্তমানের CERN প্রজেক্টের সাথে মিল পাচ্ছি; সার্নে আসলে কি হচ্ছে? সত্যিই যদি  
গড পার্টিকেলই খোঁজার চেষ্টা হয়, সেটাও নামের কারণেই শুধু গা শিরশির করে, আর আমার ধারণা, তারা  
এসব কিছুই করছেন; তারা আসলে হয় "ব্ল্যাকহোল" তৈরীর চেষ্টা করছে, নতুবা "ওয়ার্মহোল" তৈরী করে অন্য  
মহাবিশ্বে যাবার চেষ্টা করছে; অন্য মহাবিশ্বে যাবার চেষ্টা করাটা সেই জ্বজাতির মতই নিষিদ্ধ কাজে হাত দেয়া,  
আর ব্ল্যাকহোল তৈরী করা মানে তো নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে আনা; সব আবিষ্কারেরই ভাল মন্দ দু'টো দিকই  
আছে, সার্নে যা হচ্ছে সেটাকে যদি মানব জাতির ভালর জন্য কাজে লাগানো যায় তবে আপত্তির কিছু নেই, তবে  
এটমিক এনার্জির আবিষ্কার আমরা যেভাবে মানব জাতির ধ্বংসের জন্য বেশী ব্যবহার করে চলেছি সেই  
যায়গাতেই আমার ভয়। সার্নে বসে যেটাই করুকনা কেন, বিষয়টি আমার ভাল লাগছে না।

সঞ্চালক বললেন,  
-দেখেন দেখেন, এই হইলো মিস্তিরির স্বজন পিরিত্তি; ক্যামেরাম্যান এত্তো লম্বা বক্তৃতা দিল সেইটা কিছু না, আর  
আমি কইলেই এখন চিৎকার চেষ্টামেচি শুরু হবে।

ক্যামেরাম্যান বললেন,  
-আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, শেষ করুক আগে ভাতিজা, তারপর আলাপ করা যাবে সার্ন নিয়ে; ভাতিজা চালিয়ে  
যাও।

ভাতিজা এবার বিশাল সাহস নিয়ে ভালভাবে গেড়ে বসলো, ভাবনা ক্লাবের অন্তত তার একজন, ক্যামেরাম্যান  
কাকার স্বীকৃতি তো সে পেয়েছে। সে আবার শুরু করলো,

-সমস্যা বাঁধলো অন্য যায়গায়; এই পুরো রবোটিক সিস্টেমে প্রয়োজন ছিল প্রচুর পাওয়ার বা এনার্জি বা শক্তি;  
যেটা তৈরী হত এক বিশেষ সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের তৈরী সম্পূর্ণ রবোটিক পিরামিড সিস্টেমের মধ্যবর্তী স্থান  
এটলান্টিসে; জ্বজাতির বৈজ্ঞানিকেরা এটলান্টিসের দায়ীয়ে থাকা জ্বজাতির কাছে বারোবারে আরো বেশী আরো  
বেশী পাওয়ার চাইতে লাগলো; বোম্বার সুবিধার জন্য এই শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রকে আমরা আজকের বিশ্বের  
এটমিক পাওয়ার জেনারেশনের মত কিছু ধরে নিতে পারি, তবে তাদেরটা ছিল আরো শক্তিশালী কিছু;  
এটলান্টিসের যারা দায়ীয়ে ছিল, তারা একসময় জানালো, এর চেয়ে বেশী পাওয়ার দিলে তাদের পাওয়ার স্টেশন  
চাপ নিতে পারবে না এবং পৃথিবীর বিশাল একটা অংশ ধ্বংসে পরে পানির নীচে চলে যেতে পারে, এমনকি পুরো  
প্রজেক্টই ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, যেটা তারা করতে চায় না।

সকলের সমর্থন থাকায় আমি আর ভাতিজার গল্প থামাবার চেষ্টা করলাম না,  
-খবরটা সাথে সাথে নিবিরুতে পাঠানো হল; সেখান থেকে নির্দেশ আসলো, যদি "এটলান্টিস" প্রজেক্টের চাহিদা  
মাফিক পাওয়ার না দেয় তবে এমনিতেও এটলান্টিসের সহ তাদের সকলকে ধ্বংস করে দেয়া হবে; এটলান্টিস  
বাধ্য হল পাওয়ার দেবার ব্যবস্থা করতে; শেষবারের মত যখন পাওয়ারের সর্বোচ্চ সাপ্লাই দিল আটলান্টিস, চাপ  
নিতে না পেরে, বর্তমান ইউরোপ আর আমেরিকার মধ্যবর্তী অংশটি শুধু অথৈ সাগরে বিলীনই হয়ে গেলনা বরং  
আরেকটি মহাপ্লাবনের কারণে সমস্ত পৃথিবী ভেসে গেল, পিরামিড সিস্টেম সহ সব চলে গেল শত শত ফুট বালির

নীচে; স্বজাতির প্রানী গুলো বেশ কিছুদিন রইলো পানির ভেতরে, যতদিন আবার না শুষ্কতার সন্ধান পেল তারা; ঘটনাটি ঘটলো আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে; কাল সম্পর্কে আগেই বলেছি, একটু এদিক সেদিক হতেই পারে এবং কালের ইতিহাসে সেই একটু এদিক সেদিক মানে পাঁচশো বছর কোন বিষয়ই না।

আজগুবি শব্দটার সংজ্ঞা বোধহয় ভাতিজার গল্পের মাঝেই আছে,

-এখন কথা হল, পুরো এনার্জি পাবার পর, এটলান্টিস ধ্বংসে পরবার মুহূর্তে স্বজাতির বৈজ্ঞানিকেরা পিরামিডের রোবটিক হার্ডওয়্যারের মাধ্যমে কিছু একটা দেখেছিল কি? তারা কি সৃষ্টি রহস্য আঁচ করতে পেরেছিল এক মুহূর্তের জন্য হলেও; মনে হয়, কিছু একটা ক্ষণিকের তরে তারা পেয়েছিল।

এদিকে দুটো ঘটনা একই সাথে ঘটে চলেছিল। এক, পিরামিডের মাধ্যমে সৃষ্টি রহস্যের গভীরে যাওয়ার বা সৃষ্টিকর্তাকে খোঁজার বিষয়টি আজাজিল পছন্দ করছিল না বলে সব সময় সে এর বিরুদ্ধে ছিল, আজাজিল স্বজাতির সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করতো, সৃষ্টিকর্তার রহস্য ভেদ করা মানে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনা; আর এই কারণেই স্বজাতির বেশীর ভাগ যেমন তাকে অন্তত ঐ সময় অপছন্দ করতো, আবার এই একই কারণে সৃষ্টিকর্তা আজাজিলের ওপর খুশী ছিল এবং সরাসরি যোগাযোগ রাখতো এবং তৎকালীন সৃষ্টি সমূহের মাঝে সর্বোচ্চ পছন্দের যায়গাটি আজাজিলের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল।

মুক্তির গল্প থেকে আজা আমার মুক্তি পাওয়া হবে না,

-আর দ্বিতীয় ঘটনাটি হচ্ছে, সৃষ্টি কর্তাও স্বজাতির এই সব বিশৃঙ্খল কর্মে বিরক্ত হয়ে আরেক সৃষ্টিতে হাত দিলেন, সেই সৃষ্টির নাম মানুষ; আমাদের আদীমতম মানুষটির নাম ধরে নেই আদীম মানুষ; সৃষ্টি কর্তা নিজে মানুষকে সর্ব বিষয়ে শিক্ষিত করে তোলা শুরু করলেন কোন এক মহাবিশ্বের কোন এক যায়গায় এবং এক সময় মানুষকে সকল সৃষ্টির সেরা হিসেবে মেনে নিতে বললেন আজাজিল সহ সৃষ্টিকর্তার আদেশ বহনকারীদের; সকলে মেনে নিল কিন্তু আজাজিল নিজের শ্রেষ্ঠত্ব চলে যাচ্ছে দেখে এর বিরুদ্ধে চলে যাওয়ায় সৃষ্টিকর্তার নির্দেশে আজাজিলকে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ স্থান থেকে বিচ্যুত করে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনা হল; আজাজিল শোকে দুঃখে কাতর হয়ে মানুষ কে স্বজাতির মতই বিশৃঙ্খল করার অনুমতি চাইলে সৃষ্টি কর্তাও অনুমতি দিয়ে বললেন, আমি আদীম সন্তানের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে রইলাম, যদি তারা আমার কথা মত চলে তবে তুমি কখনোই তাদের অতটুকু বিশৃঙ্খল করতে পারবেনা যেটা স্বজাতি হয়েছিল। আরো ঘোষণা করলেন, আমি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিছুদিন পরপর মানব জাতির জন্য পৃথিবীতে মহামানব পাঠাবো, যাতে স্বজাতির মত মানুষও সৃষ্টির মাঝে বিশৃঙ্খলা তৈরী না করে সঠিক পথে চলতে পারে; স্বজাতির যারা আজাজিলের অনুসারী হবে তাদের নিয়ে আজাজিল চেষ্টা চালিয়ে যাক মানুষকে বিপথগামী করার, আর যারা আজাজিলের সাথে যাবে না, তারা ইচ্ছে করলে নিবিরুদ্ধেও থাকতে পারে আবার পৃথিবীতেও থাকতে পারে; যারা আজাজিলের সাথে যাবে না তারা মানবজাতির নেতৃত্ব মানতে বাধ্য থাকবে।

এবার মনে হল বিদ্রোহ করে ভাতিজাকে বলি, থামলে ভাল লাগে, কিন্তু সকলের আগ্রহ দেখে সেকথা বলার সাহস পেলাম না,

-শুরু হল পৃথিবীর নতুন ইতিহাস। ভাল আর মন্দের দ্বন্দ্বের ইতিহাস; নিষিদ্ধ আর অবশ্য পালনীয় এর ইতিহাস; এর মাঝে ঘটলো আরেকটি ঘটনা; মানুষও স্বজাতির মতই অবাধ্য হয়ে উঠতে শুরু করলো মাঝে মাঝেই; মহামানবেরাও পারছিলেন না তাদেরকে সঠিক যায়গায় ধরে রাখতে; তাই সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর বুকে প্রবল বৃষ্টির মাধ্যমে আরেকটি মহাপ্লাবন তৈরী করে, নতুন পৃথিবী দিয়ে কাজ শুরু করতে চাইলেন; আরেকটি প্লাবনের মাঝ দিয়ে পুরোনো প্রায় সব কিছু ধুয়ে মুছে, সৃষ্টি কর্তার পছন্দ অনুযায়ী মানুষ ও অন্যান্য প্রানী প্রজাতির একটা অংশ নিয়ে শুরু হল পৃথিবীর নব্যযাত্রা, সৃষ্টির নব্যযাত্রা, আজ থেকে প্রায় সাত হাজার বছর আগে।

ভাতিজার গল্প চলছে তো চলছেই,

-সবচেয়ে মজার বিষয় হল ত্রিশ অক্ষ রেখা; পৃথিবীর সকল মহাপ্লাবনের পর ত্রিশ অক্ষরেখার আশেপাশের অংশ আগে শুকিয়ে যেত; এবারও নতুন জীবন শুরু হল ঐ বরাবরই; তারপর আস্তে আস্তে মানুষ ছড়িয়ে পরলো বিভিন্ন দিকে; হাম বংশের লোকজন এলো আমাদের দিকে, অর্থাৎ, পূর্ব দিকে, ইয়াফিসেরা গেল পশ্চীমে, অর্থাৎ, তুরস্ক, বলকান হয়ে ইউরোপে আর শ্যাম বংশ রয়ে গেল আরব এবং পরবর্তীকালে আফ্রিকা; আর এই ত্রিশ



অক্ষাংশ বরাবরই পরবর্তী সভ্যতা, মিসরের ফেরাউনের রাজত্ব গড়ে উঠলো আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে।

যে ভাবেই হোক, আমার ধারণা, সাত হাজার বছর আগের মহাপ্লাবনকালীন প্রবল বর্ষনের কারণে পিরামিডের কিছু অংশ বেরিয়ে এলো লোক চক্ষুর সামনে, যেটা ফেরাউনেরা নিজেদের সমাধি স্থল হিসেবে ব্যবহার করে স্বজাতি সৃষ্ট আদি ডিজাইন নষ্ট করে ফেললো; এরকম পৃথিবীর সব স্থানেই স্বজাতি সৃষ্ট পিরামিডের মূল অংশ গুলো নষ্ট হয়েছে; একই পিরামিড রয়েছে বেলুচিস্তান-মহেঞ্জাদারোতে, একই জিনিষ রয়েছে মেক্সিকোতে, একই জিনিষ রয়েছে আটলান্টিকের অতল গহ্বরে, একই জিনিষ রয়েছে ত্রিশ অক্ষ বরাবর বহু স্থানে যা কিনা কালের বিবর্তনে ও আদি মানুষের নির্বোধ কর্মকাণ্ডে ধ্বংস হয়েছে, পিরামিডের তৈরির মূল রহস্য উদঘাটন বাধাগ্রস্ত হয়েছে; এমনকি প্রায় বাইশ শো বছর আগেও মার্ক এলেক্সান্দ্রী আর ক্লিওপেট্রা যুগল, পিরামিডের সকল সোনা লুট করেছে বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায়; অবশ্য সৃষ্টিকর্তাই হয় তো চান নাই পিরামিডের মূল রহস্য উদঘাটিত হোক। এবার আরেকটু কালের সাগরে লাফ দেই।

বলে কি ভাতিজা, কালের সাগর!! তাহলে কি এতোক্ষণ সে নদীতে ছিল,  
-আজ থেকে সারে তিন থেকে চার হাজার বছর আগের গল্প বলি, কিছুটা ধর্মীয়; স্বজাতির একটি গোত্র তখন মানুষের সম্পূর্ণ অনুগত; শুধু মাত্র আজাজিলের অনুগতরা ছাড়া স্বজাতির সকলেই মানব মহাপুরুষ দ্বারা হেদায়েত প্রাপ্ত; তখন এক হেদায়েতকারী এসেছিলেন, তার সময়ে দুটো ঘটনা ঘটলো; এক, আনুনািকির কথা আগেই একবার তুলেছিলাম; এরা আসলে স্বজাতির দ্বারা ক্লোন করে বানানো এক ধরনের বিশাল কিছু প্রাণী, মানুষের গঠনের সাথে তাদের শারীরিক গঠনে কিছুটা মিল থাকায় তাদের কে মানুষের পূর্ব পুরুষ বলে অনেকেই মনে করে, কিন্তু আনুনািকির সাথে মানব ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নেই; আনুনািকিরা প্রজজন ক্ষমতা শূন্য ছিল, তবে তারা ছিল দীর্ঘায়ু সম্পন্ন, ধরে নেই তাদের আয়ু তিন হাজার বছর; সেই সারে তিন হাজার চার হাজার বছর আগে সর্বশেষ আনুনািকি জীবিত ছিল যার নাম উজ এবং এই শেষ আনুনািকি নিহত হয়েছিল সেই মহামানবের হাতেই; এবং দ্বিতীয় ঘটনা হল, ওনার সময়েই দ্বিতীয়বার নিবিরু গ্রহটি পৃথিবীর পাশ দিয়ে যায়, যে কারণে লোহিত সাগরের পানি সরে গিয়েছিল এবং মোটামুটি একটা আঞ্চলিক বন্যা হয়েছিল, রোগে ভরে গিয়েছিল মিসরের আশে পাশের অঞ্চল।

ইঞ্জিনিয়ারের বোধহয় ঘুম পেয়ে গিয়েছে। আর থাকতে পারলো না। বললো,  
-ভাতিজা, আর পাহাডায় থাকতে পারুম না; আর কত বড় গল্প শুনাইবা; এই গুলার অনেক কিছুই তো আমরা হক্কে কিছু কিছু জানি; আমারে বুঝ দিবার লাগি খালি খালি স্বজাতি স্বজাতি কইতেছো, আসলে ঐটা স্ত্রীনের কথাই কইতেছো আর আজাজিল যে ইবলিশের আরেক নাম সেইটাও জানি; এইবার শেষ করা যায় না।

মুক্তি বললো,  
-আর একটু; এই তত্ত্বটা না ঝাড়লে আমি শান্তি পাবো না; হযরত সোলায়মান ছিলেন আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগে; তিনি বিমানে চড়ে বিভিন্ন যায়গায় যেতেন বলে কথিত আছে; জ্ঞানে বিজ্ঞানে তার আমল নাকি এখনকার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না; এবং সেটা তিনি করেছিলেন এই স্বজাতিকে নিজের আঞ্জাবহ করে; আরও কথিত আছে, ওনার স্ত্রী বিলকিসও ছিলেন স্বজাতিয় মাতা "রায়হানা" এবং মানুষ জাতি থেকে পিতা "সারাহিল" এর সন্তান; কথিত আছে হযরত সোলায়মান এই স্ত্রীনের নিয়ন্ত্রন করতেন একটি আংটির মাধ্যমে এবং তার মৃত্যুর পরে এই আংটিটি সমুদ্রের কোন গহীনে ফেলে দিয়েছিল তারই অধীনস্থ স্ত্রীনেরা; সুতরাং, সম্পূর্ণ আঞ্জাবহ স্ত্রীনের আর পাবে না মানুষ কখনোই।

ভাতিজা একটু সোজা হয়ে বসায় মনে হল এবার তার গল্পের শেষের দিকে চলে এসেছে,  
-আমার আর মাত্র তিনটি কথা আছে, সবই আমার বিশ্বাসের কথা; এক, নিবিরুর আবার পৃথিবীর কাছাকাছি আসবার সময় হয়ে গিয়েছে; আজ থেকে যে কোন সময়ে যখন নিবিরু গ্রহটি আমাদের পৃথিবীর কাছাকাছি আসবে, সেই সময়ে প্লাবন বলেন, রোগ বলেন, কিছু তো একটা হবেই; তবে নিবিরুবাসী কি আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে? করতেই পারে; তাদের ওখানে যদি অশুভরা ক্ষমতায় থাকে তবে তো মারাত্মক কিছু একটা ঘটতেই পারে।

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ হল, এই যে এতো গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর গল্প শুনালেন, সেই গ্লোবাল ওয়ার্মিং কি শুধুই মানব সৃষ্ট কারণে, নাকি নিবিড় নামের উত্তম গ্রহটি আমাদের পৃথিবীর কাছাকাছি চলে এসেছে বলেই গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে, সেটা আপনারা একটু ভেবে দেখবেন।

সর্বশেষে, আপনারা যে কোয়ান্টাম মেকানিক থিয়োরীর কথা বললেন, সেটা আমি যতটুকু বুঝেছি সেই অনুযায়ী ধরে নেই, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটি একক পদার্থ, সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই যে বিলিয়ন ট্রিলিয়ন নক্ষত্র, তারসাথে গ্রহ উপগ্রহ এবং প্রানী জগৎ গুলো সব সেই পদার্থের মৌলিক কণা, অর্থাৎ, কোয়ান্টাম ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি; এখন সৃষ্টিকর্তা যদি আমাদের দেখেন তবেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব আছে, আর যদি না দেখেন তবে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বই নাই; সৃষ্টির জ্ঞানের মহাসাগরে আমাদের জ্ঞানী ব্যক্তিজনেরা যে ভাবে অসীম জ্ঞানের জলরাশীর মাঝে হাবুডুবু খেতে খেতে জ্ঞানের শেষ সীমান্তে পৌঁছাতে চাইছেন, সেটার পরিণতি আমার মনে হয় অন্ধের হাতি দেখার গল্পে যেয়ে শেষ হবে; অসীমের সীমা লঙ্ঘন না করে খোঁজা উচিত, কখন কি কারণে সৃষ্টিকর্তা আমাদের দেখতে পাবেন; সৃষ্টি রহস্যের সমাধান দেয়া আছে খোঁজার মধ্যে, সঠিক ভাবে খুঁজতে জানলে সমাধান কোন বিষয়ই নয়।

মুক্তির কথা যে খুব মনযোগ দিয়ে শুনছিলাম তা নয়, একটা ক্রিমুনির ভাব এসে গিয়েছিল বলেই হয়তো খেয়াল করিনি, আমি বসা ছিলাম আগুনের ডান দিকের পাশে, হঠাৎ দেখি আমার একদম মুখের সামনে কঞ্চল দিয়ে মোড়ানো একটা মুখ, খুব বেশী হলে আমার কাছ থেকে দুইহাত দূরে, তারপরো পুরো স্পষ্ট অবয়বে হাজির হতে পারেনি, কিছুটা ভৌতিক বটেই, আমি লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে বললাম,  
-কে কে?

গলার আওয়াজে বুঝলাম ওটা বাগানের এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নীরুর মুখ। নীরু বললো,  
-সকাল সাতটা বাজে, আপনারা এখনো এখানেই বসে আছেন, আমি আরো ভাবলাম, রাস্তা হারিয়ে জঙ্গলে পরে আছেন, আপনি না সকাল আটটার মাঝে রওনা হবেন; ঘুমাবেন না? আমাদের বাগানের মালিক নানকা সাহেব যে সমস্ত আয়োজনের নির্দেশ দিয়েছেন, তাড়াতাড়ি না ফিরে আসলে উনি দুঃখই পাবেন মনে।

আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম। আমি বললাম,  
-ভাতিজা, বিশাল গল্প শুনাইলা, আজকে আর না ঘুমালেও চলবে, একটু হাত মুখ ধুয়ে রওনা দিয়ে দেই, আগে আগে গেলে আগে আগে আসা যাবে।  
ইঞ্জিনিয়ার বললেন,  
-সারাটা রাইত গেল ভয়ের গল্প শোনার আশায়; এখন আবার আশায় রইলাম আইজ দারুন একখান দিন কাটামু।  
সঞ্চালক আমাকে প্রশ্ন করলেন,  
-ভাই, আপনার কি না গেলেই না।  
আমি বললাম,  
-আপনারা ছোট্ট একটা ঘুম দিয়ে নিন, আমরা যাবো আর আসবো, দুপুরের খাওয়া একসাথেই খাবো ইনশাআল্লাহ, আমাদের একটা কর্মী সভা আছে, না গেলেই না।

একটা দিন গেল বটে। পুরো চব্বিশ ঘন্টা না ঘুমিয়ে শুধু আড্ডা, শুধুই কথা। সবাইকে ফেলে আলাদা হবার কোন ইচ্ছেই কেন যেন হচ্ছে না। তারপরও যেতেই হবে। রওনা হয়ে গেলাম তাড়াতাড়িই। মনে বড় আশা, যেতে আসতে তিন চার ঘন্টা, মিটিং এক দুই ঘন্টা। খুব বেশী হলে বেলা একটার মাঝেই আবার আড্ডায় বসে যাবো। গাড়িতে একটু ঝিমিয়ে নিলে ঘুমকে আপাতত ঠেকা দিয়ে রাখা যাবে।

## **নানকার পালা**

নাহ, পারলামনা দুপুর একটার মধ্যে চা বাগানে পৌঁছাতে। যখন ফিরলাম তখন বিকেল তিনটার উপরে বাজে। এসে দেখি মূল বাংলোর সামনে হেঁচ এঁচের মেলা বসে গিয়েছে। হাতির পিঠে চড়ে চিৎকার করে টারজেনের মত

শব্দ করছে ইঞ্জিনিয়ার, ঘোড়া দৌঁড়াচ্ছেন আমাদের ক্যামেরাম্যান, দুই তিনটা হরিনের সাথে একটা গাধা তাদের আসে পাশে ঘোরাঘুরি করছে। সঞ্চালক মহোদয় একজন প্রবীন ভদ্রলোকের সাথে বসে চা খাচ্ছেন। আমি এগিয়ে আসতেই সঞ্চালক পরিচয় করিয়ে দিলেন প্রবীন ভদ্রলোকের সাথে, আমাদের নানকা ভাই, এই চা বাগানের মালিক।

ভদ্রলোকের বয়স কত বোঝার উপায় নেই, শুকনো গড়নের সাথে ক্লিন শেভ, মাথা সম্পূর্ণ খালি। ভদ্রলোককে শুধু মিশুক বললে ভুল হবে, কর্মশক্তি আর প্রানচাঞ্চল্যে ভরপুর এক প্রবীন তরুন।

প্রথমেই শুনতে হল নানকা ভাইয়ের অনুযোগ,

-আপনাদের জন্য সব কাজ ফেলে গতকাল সারাদিন বসে রইলাম, আর আজ তো রাত পর্যন্ত আছি আপনাদের সাথে; তারপরও আপনাদের মেহমানদারীর ভাগে পেলাম মাত্র দুই বেলা, সেই দুই বেলার মাঝেও আপনাদের পূর্ণাঙ্গ শক্তির দল পাবো মাত্র এক বেলা।

আমি বললাম,

-দুঃখিত ভাই, আসলে নির্বাচন চলাকালীন সময়ে নিজের মত করে সব কিছু করা যায় না; আজ সব কিছু ফেলে এলাম, তারপরও আসতে আসতে দেরী হ'য়ে গেল; এরপরও সকলের সাথে ঢাকায় ফেরা আর সম্ভব হচ্ছে না।

সঞ্চালক অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,

-আপনি কাল আমাদের সাথে যাচ্ছেন না।

আমি বললাম,

-সম্ভব হচ্ছেনা; শুক্রবার বিরাট কিছু নির্বাচনী আয়োজন আছে, শেষ করে রাতের বাসে রওনা হয়ে শনিবার ভোরে পৌঁছাবো বলে আশা করছি, স্যাটারডে ক্লাবের নিয়মিত ভাবনা সভায় ঠিক সময় মতই পৌঁছে যাবো ইনশাআল্লাহ।

ক্যামেরাম্যান আবার জিপ্তোস করলেন,

-আপনাদের ইলেকশনের তো দেরী আছে, আপনি কি শুধু স্যাটারডে ক্লাবের জন্য ঢাকা ফিরবেন নাকি?

আমি বললাম,

-নাহ, শুক্রবার রাতের বাসে ফিরছি শুধু স্যাটারডে ক্লাবের জন্য নয়, ঢাকায় রবিবারে একটা জরুরী এপয়েন্টমেন্ট আছে, সেরে আবার সোমবার থেকে সিলেটে।

সঞ্চালক বললেন,

-এভাবে রাতের বাসে একা একা যাওয়া আসা করাটা ঠিক না।

আমি বললাম,

-আমাদের ঢাকা-সিলেট রাস্তা ভাল, তাছাড়া মুক্তি ভাতিজার ঢাকায় কি একটা কাজ আছে, সে আমার সাথে থাকবে।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-কাজ তো ভাই সবই জরুরী, তবে নিজের প্রানটা কিন্তু আরও বেশী জরুরী, বিনা কারনে বেশী রিস্ক নেয়া ঠিক না; থিয়োরী অব প্রবাবিলিটিতে মিললেও না।

আমি বললাম,

-টাইম টানেল তো সঞ্চালক সাহেবের কাছেই শোনা, ভবিষ্যৎ তো নির্ধারণ করাই আছে।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-থিয়োরি, ইতিহাস, অতীত অভিজ্ঞতা এসব শুধু রেফারেন্স হিসেবেই কাজ করে, কখনোই আপনার কর্মের ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলেনা।

ইঞ্জিনিয়ার উত্তেজিত কর্ণে কিছু বলতে বলতে এসে বসলেন আমাদের সাথে। আমি বললাম,

-অস্থির কেন, কি হয়েছে একটু ঠান্ডা হয়ে বসে ধীরে সুস্থে বলেন।

ইঞ্জিনিয়ার হড়বড় করে কথা বলা শুরু করলেন,

-আরে ধীরে সুস্থে বলার বিষয়নি এইটা; নানকা ভাই একথান ঘটনাই ঘটাইছে আইজকা; খাওয়ার আয়োজন দেইখা একটু রাগই হইলো; মানুষ মারার বন্দোবস্ত কইরা রাখছে; কাইল যা খাইছেন তার তিনগুন; এতো খাওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবেই মনের মইধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনা আকুলি বিকুলি শুরু করলো, তাই বাইরে আইসা ঘাসের উপর একটু হাঁটাইয়া করতৈছি, হঠাৎ দেখি সামনে পুরা চিড়িয়াখানা আইল্লা হাজির করছেন নানকা ভাই; আমি দেইখাই বুদ্ধি কইরা কইলাম, আইজ সঙ্কলের সব কিছু চড়া লাগবে; আমি নিজে হাতি, ঘোড়া চড়াইছি, গাধার কাছেও যাই নাই কিন্তু বাকি সবাইরেই গাধার পিঠে চড়াইছি; আমারে গাধার অধম কওয়া ছুটাইয়া দিছি আইজ।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-ভারবাহী গাধার পিঠে উঠলাম আমরা আর আপনি হয়ে গেলেন গাধার উত্তম, যুক্তিতে মেলাতে পারলাম না ইঞ্জিনিয়ার সাহেব।

আজ বাগানে ঢোকর পর থেকেই দেখছি ইঞ্জিনিয়ার তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে শুধু। সেভাবেই তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন,

-যুক্তি পান নাই মানে, গাধার পিঠে উঠার আগে সকলেই তো গাধার নীচেই দাঁড়াইছেন, তাইলে গাধার অধম হইলো কে।

নানকা ভাই ইঞ্জিনিয়ারে কথা গুলো ঠিক ধরতে পারছেন না, তবে ইঞ্জিনিয়ারের উত্তেজনাটা বুঝতে পেরে বললেন,

-এখানে বসে সারারাতই কথা বলা যাবে, চলুন এমন এক যায়গায় নিয়ে যাই যেখানে সাধারণ মানুষ কখনোই যেতে পারবেনা; এমনকি বিজিবিও সেখানে খুব সাবধানে যায়; সন্ধ্যার আগেই যেয়ে আবার ফিরে আসতে হবে।

আমি বললাম,

-কোথায় নিতে চাইছেন।

নানকা ভাই বললেন,

-বর্ডারের একদম পাশে, সত্যি বলতে কি যাবার পথে একেবারে ভারতের সীমানা পিলার ঘেসে যেতে হয় যায়গাটিতে, পাহাড়ী এক নদী, এই দৃশ্য না দেখলে মিস করবেন।

আমরা আর কথা না বাড়িয়ে উঠে পরলাম। নানকা সাহেব বাগানের ভেতরে চলাচলের জন্য ব্যবহার করেন বহু পুরানো আমলের একটা ল্যান্ড রোভার। উঠলাম গাড়িতে। ওরে বাব্বাহ, বাইরে থেকে পুরানো ল্যান্ড রোভার ভেবে ভুল করেছিলাম, এই গাড়ি তো পঞ্জীরাজ বললেও কম বলা হবে, ইঞ্জিন বদলে এমন শক্তিশালী ইঞ্জিন লাগানো হয়েছে যে, বিশাল চড়াই উৎরাই, তাও মেঠো পাহাড়ী পথ সাইসাই করে পারি দিচ্ছে। ওনার চালানো দেখে মনেই হলো না যে ওনার বয়স প্রায় ৮০ এর ঘরে; বয়সটা গল্পে গল্পে ওনার বলা। ২০ বছরের একটা তরুন যেরকম ভয়হীন ভাবে গাড়ি চালায়, ওনার চালানোও ঠিক একই রকম।

আমাদের বেশীর ভাগ বাঙ্গালীদের একটা স্বভাব আছে বলে আমি মনে করি, সেটা হল, কারও সাথে পরিচয় হবার পর নাম দিয়ে যদি ধর্ম নিশ্চিত না হওয়া যায়, তখন তার ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন না করা পর্যন্ত পেটের ভেতরে কেমন যেন ঘুটুর ঘুটুর করে মোচড়াতে থাকে। আমি যে এই দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তা ঠিক নয়, তবে সযত্নে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি। নানকা সাহেব বোধহয় এতোদিনে বাঙ্গালীর এই চরিত্রটি অনুধাবন করে ফেলেছেন, তাই বয়স আর ধর্ম সম্পর্কে শুরুতেই আমাদের একটা সাম্যক জ্ঞান দান করে ফেললেন, জানলাম তিনি খ্রিষ্টান। গাড়িতে উঠেই আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল সঞ্চালকের কাছে, বললাম,

-ভাই, স্ত্রীনের সমস্যার সমাধান হয়েছে কি?

সঞ্চালক উত্তর দেবার আগেই নানকা ভাই বললেন,

-হ্যা হ্যা, সমাধান হয়ে গিয়েছে; ভাইয়ের কথা মত দীঘি পেরিয়ে ওনার আল্লীয়ের বাগানের একটা টিলা পার হতেই দেখি মিষ্টি গন্ধ ছড়াচ্ছে বিশাল এক ফুল গাছের ঝোপ থেকে; সুন্দর ফুলের গাছগুলো কাটতে খুব দুঃখ হচ্ছিল, কিন্তু কাটতে হল, আসলেও মাথায় কিম ধরানো এক সুগন্ধ; কেটে একেবারে গোড়া থেকে তুলে এনে আগুন দিয়ে যায়গটাই পুড়িয়ে দিয়েছি।

এসব গল্পের মাঝেই আমার দৃষ্টি কেড়ে নিল একটা ছোট্ট লোহার ব্রীজ, সিলেটের “কীন” সেতুর আদলে গড়া কিন্তু তার দশ ভাগের একভাগ হতে পারে একটি ব্রীজ। ব্রীজের ওপর আবার নির্মান সালটাও লেখা, ১৯২৫। নানকা ভাই খুব গর্বের সাথে ঘোষণা দিলেন, এটা আমাদের এই চা বাগানের নিজস্ব সেতু। গল্পে গল্পেই চলে এলাম সেই আমাদের স্পটে।

আহা কি দৃশ্য, এদৃশ্য জাফলং কিংবা বিছানাকাল্দিতে দেখা অসম্ভব। পাহাড়ী এক নদীর কাছে এসে আমরা পৌঁছালাম। নদী বলা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছি না, কারণ, পাহাড়ী নদী আমি বহু দেখেছি কিন্তু এমন চওড়া, খড়স্রোতা নদী খুব কম দেখেছি। দেশ বিদেশ তো কম ঘুরলাম না কিন্তু এদৃশ্য আমি কখনো কোন দেশে দেখিনি। ভাষায় বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব না। সকলেই অভিভূত, বাকরুদ্ধ, একমাত্র মুক্তি ছাড়া। তাকে এরকম খুশীতে নাচতে কখনো দেখিনি। স্বচ্ছ কাঁচের মত গোড়ালী ছুঁয়ে যাওয়া গভীরতায় কখনো গড়াগড়ি থাকে, কখনো আরও গভীর পানিতে চলে যাচ্ছে, কখনো মনে হচ্ছে হাত বাড়িয়ে পাহাড় গুলো ধরার চেষ্টা করছে। দূরের পাহাড় গুলো ধোঁয়াশায় ঢেকে প্রকৃতিকে আরও মাধুর্যময় করে তুলেছে। আমাদের কান্ড কারখানা দেখে নানকা ভাইও চুপ মেরে গিয়েছিলেন। তার গলার শব্দে বোধহয় আমাদের ঘোর কাটলো। উনি বললেন,  
-ভাই, সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ফিরতে হবে; সন্ধ্যার পর যাবার রাস্তায় ধরে নিতে পারেন কারফিউ, দেখলেই গুলি, তখন আর নানকাকে চিনবে না।

যায়গাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছিল না, আবার আসবার ইচ্ছে নিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। যে দৃশ্য দেখে এলাম সেই দৃশ্যের ঘোর কাটছেন আমাদের কারোই। ফেরার পথেও সকলে ভাষাহীন, সন্ধ্যা পেরিয়ে গিয়েছে। পথে কারো মুখে কোন ভাষা নেই।

৫

## সাধু বাবার গল্প

এই শান্ত পরিবেশের মাঝে নানকা ভাই বললেন,  
-এখান থেকে আধা কিলোমিটার দূরেই এক সাধু বাবা আছেন, যাবেন নাকি। বেশ ভাল সাধক, কারো সাথে কথা বলেন না, দেখা করেন না; আমার সাথে গেলে দেখা পাবেন নিশ্চিত।

সঞ্চালকের এসব বিষয়ে কোন কালেই আগ্রহ ছিল না, ইঞ্জিনিয়ার তো স্ত্রীন ভুতের ভয়ে অস্থিরই আছেন, সাধু বাবা দেখায় আজ তার কোন আগ্রহ আছে কিনা বুঝলাম না। আমার আর ক্যামেরাম্যানের মাঝে একটা ঔৎসুক্য কাজ করার চাপে সকলেই যেতে রাজি হল। চললাম সাধু বাবার দরবারে।

সাধু বাবার দরবার! শব্দ গুলো মনের ভেতরে একটা নিজস্ব জগৎ তৈরী করে নেয়, বড় দরবার ঘর, শিস্য আর ভক্তদের ভিড়, জমজমাট একটা অবস্থা থাকার কথা। এই সাধু বাবার দরবারে এসে কিছুটা মনঃক্ষুব্ধই হলাম। শীতের কুয়াশা ঢাকা রাত্রে যেখানে এসে নানকা ভাই আমাদের নামতে বললেন, সেখানে জনমানুষের কোন চিহ্নই নেই। পাশেই একটা ঝোপের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলেন নানকা ভাই, আমরা পিছু নিলাম তার। চারিদিক নিস্তরতায় ভরা এক শূন্যতা বিরাজ করছে। ঝোপের মাঝে ছোট্ট এক উঠোন। উঠোনের এক পাশে চা শ্রমিকদের ঘরের মতই আট ফুট বাই দশ ফুট একটা ঘর। আরেক পাশের ঘরটিকে কুড়ে ঘরও ঠিক বলা যাবে না বরং ঝুপড়ি বলা যেতে পারে, খুব বেশী হলে ছয় ফুট বাই ছয় ফুট, উঁচু চার ফুটের খুব বেশী হবার কারণ নেই, কোন দরোজা জানলা অন্তত আমার চোখে পরলো না।। নানকা ভাই শ্রমিকদের ঘরের মত ঘরটির সামনে এসে দরোজায় ধাক্কা দিয়ে “অলোক বাড়িত আছোনি” বলে ডাক দিলেন।

একটি ৩০/৩৫ বছরের যুবক বের হয়ে আসলো, বুঝলাম এর নামই অলোক। নানকা ভাই দরোজার সামনে দাঁড়িয়েই প্রায় ফিশফিশ করে অলোককে বললেন,  
-বাবারে জিগাও দেখা করা যাইবোনি, কইও আমার লগে ঢাকা থাকি মেহমান আছেন।  
অলোক কোন কথা না বলে, ঝুপড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বেশ চড়া গলায় বললো,  
-বাবা, নানকা সাব আইছেন, লগে ঢাকার মেহমান, আইতোনি তারা।

ভেতর থেকে বেশ কর্কশ গলায় কি যেন একটা শব্দ ভেসে আসলো। অলোক আর কথা না বাড়িয়ে এক পাশে একটু সরে গিয়ে ঝুপড়ির একটা অংশ উপরের দিকে তুলে ধরলো, বুঝলাম ওটাই দরোজা; বুঝলাম, ভেতরে যাবার অনুমতি পাওয়া গিয়েছে। ভেতরে ঢুকলাম, নানকা ভাই আমাদের সবার সামনে, তারপরেই আমি, আমার পেছনে ক্যামেরাম্যান আর মুক্তি পাশাপাশি। অলোক, ইঞ্জিনিয়ার এবং সঞ্চালক ভেতরেই ঢুকলেন না। ভেতরে চুকে যা চোখে পরলো সেটা মোটেই ছন্দময় কিছু নয়। ঘরের এক কোনে টিম টিম করে একটা হারিকেন জ্বলছে, তার পাশে চুল দাড়িতে ঢাকা প্রায় উলঙ্গ, হাড়িসার একটা মানুষ মাথা নীচু করে বসে আছেন। আমাদের মুখে কোন কথা নেই, সবাই চুপচাপ। নানকা ভাই একবার শুধু অস্ফুট স্বরে বললেন,  
-বাবা বালানি।

এরপর আবারও কোন শব্দ নেই, সময় যেন থেমে গিয়েছে। মনে হল শত বছর শেষে সাধু বাবা ধীরে ধীরে মাথা তুললেন, তারচেয়েও ধীরে এক সময় চোখ মেললেন। সাধুর চোখে মনে হল সম্মহনী শক্তি আছে, চোখ থেকে চোখ সরানো যায় না, জ্বলন্ত দুইটি কয়লার টুকরো যেন চোখ দুটো। কতক্ষণ আমাদের দিকে তিনি তাকিয়ে ছিলেন জানি না। হঠাৎ হাত দুটো সামনের দিকে ঝেড়ে ঝেড়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন,  
-যাহ, যাহ, রক্ত, রক্ত, বিপদ বিপদ, ঢাকায় যাহ, ঢাকায় যাহ।

ব্যাস, আবার তিনি মাথা নামিয়ে ধ্যানে চলে গেলেন যেন, আবার চারিদিক শুনশান। আমরা আরও কিছুক্ষণ বসে রইলাম। এক সময় নানকা ভাইয়ের ইশারা পেয়ে ঝুপড়ি থেকে বের হয়ে এলাম। বাইরে বের হয়ে এসে ধাতস্থ হতে বেশ কিছুটা সময় লাগলো। অন্যদের অবস্থা কি আমার জানা নেই কিন্তু আমার মাথাটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করছিল। এক সময় পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কিত ইন্দ্রীয় গুলো যখন কাজ করা শুরু করলো তখন দেখলাম অলোক এর মাঝেই একটা চেয়ারের উপর প্লেটে কিছু নারকেলের টুকরো এনে রেখেছে। আমরা সবাই চেয়ারের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়ানো, চুপচাপ। অলোকই প্রথম নিস্তরতা ভেঙ্গে বললো,  
-বাবায় কিছু মাইতছোইনি।

আমরা কেউ কোন কথা না বলে মাথা ঝাঁকালাম শুধু। অলোক শুরু করলো সাধু বাবার গল্প। সাধু বাবাকে সে কখনোই ঝুপড়ি থেকে বের হতে দেখে না, এমনকি প্রকৃতির ডাকে সারা দেন কি ভাবে সেটাও সে জানে না। কারো সাথে তিনি কথা বলেন না। অনুমতি ছাড়া ভেতরে ঢুকলে আর নিস্তার নেই, কোথা থেকে যে টিল পান উনি, টানা টিল ছুড়তে থাকেন। দিনে একবার কিছু ফলমূল আর সন্ধ্যায় হারিকেন দরোজার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঠেলে দেয় অলোক, কখনো খান, কখনো যেমন দেয়া হয় ওরকমই থাকে। আমি জিজ্ঞাস করলাম,  
-কতদিন তুমি আছো ওনার সাথে।

অলোক যা বললো তার অর্থ দাঁড়ায়, সেও চা বাগানের একজন শ্রমিক, ঐ গ্রামেই ছিল। বছর দশেক আগে এদিকে এসে ঐ ঝুপড়ির পাশেই গাছ তলায় সাধু বাবার দেখা পায়। একই অবস্থায় দিন সাতেক দেখার পর সে নিজেই ঝুপড়িটা বানিয়ে দেয় ওনার চারপাশ ঘিরে। তারপর নানকা সাহেব কে সাধু বাবার কথা বলার পর, উনি এসে সব দেখে অলোকের জন্য পাশের ঐ ঘরটি বানিয়ে দেন।

সাধু বাবার আস্তানা থেকে আবার ফিরে এলাম মূল বাংলোর সামনের ছাতার নীচে। নানকা সাহেব একদম চুপ মেরে গিয়েছেন। বুঝলাম, এর আগে কখনো সাধু বাবার সামনে এরকম পরিস্থিতিতে তাকে পরতে হয়নি। আমাদেরও কারো মুখে কোন কথা নেই। সকলের কথা মনে হচ্ছে যেন জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। সঞ্চালক মনে হয় এই বরফ গলাবার জন্যেই একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে বললেন,

-একটা বিষয় খেয়াল করেছেন, ঢাকা শহরে মানুষ জীবনের প্রতি কেমন উদাসীন হয়ে পরেছে।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-এটা ঠিক, মোবাইলে কথা বলতে বলতে গাড়ি চালানো বা রাস্তা পার হওয়াটা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন,

-আমাগো সরকারে অবৈধ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে খুব ভাল কাম দেখাইছে; সেদিন এক ঘটনা চোখের সামনে দেখা আমি একেবারে বেকুব।

সঞ্চালক ফোরন কাটার সুযোগ ছাড়লেন না, বললেন,

-"বেকুব যখন আরো বেকুব" নামের একটা মুভি বানাতে কেমন হয় বলেন তো।

ইঞ্জিনিয়ার কথাটা হয় বোঝেন নাই অথবা ইচ্ছা করেই কানে তুললেন না, বললেন,

-সেইদিন গাড়িতে তেল ভরার জন্য গেছি, আজকাল তো রাইড শেয়ারিং এর কারণে মটর সাইকেলের ছড়াছড়ি; পেট্রোল পাম্পে ঢুইক্কা দেখি মৌমাছির ঝাঁকের মতন মটর সাইকেলের ঝাঁক; এর মধ্যে একটা গাড়ি আইসা আমার পিছনে দাঁড়াইলো তেল নেওয়ার জন্য, গাড়িটার পিছে পিছেই একখান মটর সাইকেল আইসা কি নিয়া জানি গাড়ির মানুষের লগে ঝগড়া শুরু করলো; কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্য মটর সাইকেলের চালক গুলাও হাজির হইয়া গাড়িরে ঘিরা ফেলাইয়া তুমুল হৈচৈ, একসময় সবাই মিলা হেলমেট দিয়া গাড়িরে পিটাইয়া গ্লাসগ্লেস ভাইগা যার যার মত গেলোগা। গাড়ির লোকও কিছু কইতে পারলোনা, আমি সহ আশেপাশের সবাই বেকুব হইয়া ঘটনাটা তাকাইয়া তাকাইয়া দেখালাম আর মনে মনে ভাবলাম, যেই কাম করলো এরা, হাতে যদি অস্ত্র থাকতো তাইলে গাড়ি না ভাইগা মানুষই মাইরা ফেলাইতো।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-এটা ঘটছে মানুষের অসহিষ্ণুতার কারণে; আমার কথা হল, এই অসহিষ্ণুতা হঠাৎ করে এতো প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন, মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বোধটুকুও হারিয়ে যাচ্ছে কেন?

সঞ্চালক বললেন,

-বেকুবের মত আমিও একটা গল্প শোনাই, এই বছর বিশেক আগেও অন্তত আমি এম্বুলেন্সের সাইরেন শুনলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যায়গা করে দেবার চেষ্টা করতাম কিন্তু আজকাল আমি তো বটেই রাস্তার কাউকেই দেখিনা সাইরেন শুনে যায়গা করে দেয়ার চেষ্টা করতে।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-এটাও এক ধরনের সামাজিক উদাসীনতা।

আমি বললাম,

-নাহ, আমি একমত হতে পারলাম না, আমি কেন যায়গা করে দেয়ার চেষ্টা করছি না সেটা বলি, রাস্তায় এতো ট্রাফিক, এর মাঝে এম্বুলেন্সকে যায়গা দিয়ে দেখেছি, সে কোথায়ও যেতে পারে না।

সঞ্চালক বললেন,

-ভাই, ট্রাফিক সমস্যা আগেও ছিল, বরং তখন রাস্তা এতো চওড়া ছিল না; আমার ধারণা, এম্বুলেন্স গুলোর অপব্যবহার এবং ইমার্জেন্সি সাইরেনের অপব্যবহার এর মূল কারণ; আজকাল যে কোন গাড়িতে, এমনকি মটর সাইকেলে, পারলে রিক্সা, সাইকেলেও ইমার্জেন্সি সাইরেন লাগানো থাকে, বিভিন্ন সময় এম্বুলেন্স ব্যবহার করা হয়েছে অফিস যাত্রী টানার জন্য; এসব অপব্যবহার এই সাইরেনের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছে; অথচ এখনো আমরা অগ্নিনির্বাপক গাড়ি দেখলে কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যায়গা করে দিচ্ছি।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-রাইড শেয়ারিং, ট্রাফিক, ইমার্জেন্সি ভেহিক্যাল সমস্যা বা যে সমস্যার কথাই বলেন না কেন, এগুলো আসলে কোন মৌলিক সমস্যা নয়; মূল সমস্যাটা আমার মনে হয় অন্যখানে; আমরা সব সমস্যার গভীরে না যেয়ে দৃশ্যমান সমস্যাটুকুর সমাধান করার জন্য তাড়াতাড়ি কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসি; কিন্তু ঐ সমাধানের কারণে

আরও অনেক নতুন সমস্যা যখন আমাদের সামনে পর্বতের মত মাথা তুলে দাঁড়ায়, তখন না পারি আমরা আগের যায়গায় ফিরে যেতে, না পারি সেই সমাধানের কারণে সৃষ্ট সমস্যার পর্বত ডিঙ্গাতে।

আমি বললাম,

-ভাই, আমি এই রাইড শেষারিং নিয়ে কিছু আলাপ করতে চেয়েছিলাম। আপনার কথায়, সমস্যা আর সমাধান মাথার ভেতরে জটলা পাকিয়ে এমন ট্রাফিক তৈরী করেছে যে, কোথা থেকে শুরু করবো বুঝেই উঠতে পারছি না।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-খুব সহজ কথা, ধরুন আপনার ডায়েরিয়া হয়েছে, আপনার জানা আছে পেটের অসুখের জন্য স্যালাইন দরকার, আপনি জানেন কি ভাবে ঘরে বসে খাবার স্যালাইন বানাতে হয়; ব্যাস, আগপিছ কিছু না ভেবে আপনার বাড়ির সব খাবার পানিতে এক চিমটি লবন আর এক মুঠো গুড় মিশিয়ে দিলেন; আপনার সমস্যার সমাধান তো হল কিন্তু একসময় যখন পেট ঠিক হল তখন তো আপনার আর স্যালাইন দরকার নেই, আপনার দরকার স্বাদু পানি বা ফ্রেশ পানি; আপনি তো ফ্রেশ পানিকে স্যালাইন পানি বানাবার পদ্ধতি জানেন কিন্তু স্যালাইন পানিকে ফ্রেশ পানি বানাবার পদ্ধতি জানেন না, অতএব, সমস্যার আরেকটি বড় জালের মাঝে ফেঁসে গিয়ে পানি না খেয়ে বসে রইলেন।

ইঞ্জিনিয়ার বহুক্ষণ যাবত কি যেন নিজের মনে ভাবছিলেন, হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,

-সর্ব রোগের মহোষধ, সর্ব বিষয়ে যার কোন না কোন থিয়োরি রেডি থাকে, আমাগো সেই সঞ্চালক সাবের কথা যদিও আইজকাল আমার কানে লাগে না, তারপরও আমারে আপনারা একটু বুঝাইয়া কনতো, কিছুক্ষণ আগে সর্বজনীন মহোদয় যে বেকুবের কথা কইলো, সেইটা কি আমারে খোঁচাইয়া কইলোনি।

সঞ্চালক বললেন,

-আরে স্বালা, বেকুব, গাধা এইসব শব্দ ব্যবহার করে আলোচনা করা নিষিদ্ধ নাকি; মিস্তিরি সাহেবকে একটা তথ্য দিয়ে রাখি, আমরা সাধারণত ৩০০ শব্দ দিয়ে একে অপরের সাথে কথা বলি, লেখা লেখি করি। যারা ৮০০ শব্দ ব্যবহার করতে পারে, তারা মোটামুটি বড় সাহিত্যিক হিসেবে স্বীকৃত; আমি তো আর সাহিত্যিক না, তাই একই শব্দ ঘুরে ফিরে আসতেই পারে।

ইঞ্জিনিয়ার নানকা ভাইকে বললেন,

-আপনে স্বাক্ষী, সে আমারে বেকুব বলে নাই।

সঞ্চালক বললেন,

-যদি নানকা ভাইরে স্বাক্ষী মানো তাইলে আমি কি বলছি মনে নাই।

## **মুক্তিযোদ্ধা সিংহ সাদিক**

প্রথমত নানকা ভাই আমাদের কথাবার্তার জটিলতাটুকু বুঝতেই পারছিলেন না, এর মাঝে সঞ্চালক এবং ইঞ্জিনিয়ার তার নাম জড়িয়ে তাকে স্বাক্ষী মানার কারণে কিছুটা বোধহয় অস্বস্তি বোধ করে প্রসঙ্গ ঘুরাবার জন্য বললেন,

-আমাদের বাগান থেকে মাত্র মাইল বিশেক দূরে একটা শহর আছে, সেখানে বিখ্যাত এক মুক্তিযোদ্ধা সিংহ সাদিক ভাই থাকেন, যাবেন নাকি দেখতে তাকে।

আমি বললাম,

-সে তো বিখ্যাত ব্যক্তি।

সঞ্চালক বললেন,

-এখন আর এতো দূরে শহরে যাবার চেয়ে বাগান শ্রমিকদের উৎসবে যাবার জন্য তৈরী হই আমরা।

নানকা ভাই বললেন,



-ওটাতো বিয়ের দাওয়াত, মাঝরাতে তাদের অনুষ্ঠান; তাদের উৎসব যদি দেখতে চান তবে কিছুদিন পরে আসুন; তাদের সবচেয়ে বড় বসন্ত উৎসব বা “ফাগুয়া উৎসব” হবে তখন; ঐ সময় দেখবেন তাদের লাঠি নাচ, ঝুমুর নাচ, সাওতাল নাচ; মাদল, করতাল আর বাঁশের তৈরী এক ধরনের বিরাটাকার বাঁশী এবং তালের অদ্ভুত মূহুরা; মেয়েরা আসে বাপের বাড়ি, তরুন তরুনীরা রং বেরঙের সাজে নাচের দল নিয়ে বেরিয়ে পরে; আবার কিছুদিন আগে চলে গিয়েছে তাদের আরেকটি বড় উৎসব, ভাদ্র মাসের উৎসব, ঐ সময় মূলত ঝুমুর নাচের বিভিন্ন ভালে খেমটা, খাড়িয়া নাচ চলতে থাকে সারা রাত; সাওতালদের বিশেষ আরেক নাচ তাদের মঙ্গল পূজায় করে “সাওঁল” নাচ; চলে আসেন কিছুদিন পরে, দাওয়াত রইলো।

ক্যামেরাম্যানের পরের কথার ধরনে আঁচ করে নিলাম যে সাধু বাবার ঘটনাটি ওনার মনে বেশ দাগ কেটেছে। উনি আজ রাতে অন্তত আর কোন অপরিচিত পরিবেশে যেয়ে আবার কোন অস্বাভাবিক ঘটনার মথামুখি হতে চাইছেন না, কিছুতেই সিংহ সাদিক ভাইয়ের ওখানে যাবেন না, বললেন,  
-ইচ্ছে রইলো আসবার, তারিখটা জানাবেন; এবার আমরা এসেছি আপনার আতিথেয়তায় প্রকৃতির কাছাকাছি কিছু নিরিবিলা সময় কাটাবার জন্য, শহরে ফিরবো আগামী কাল, আজ আর কোন শহরে যাইনা।

নানকা ভাই চাইয়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললেন,  
-ঠিক আছে, পরেরবার যখন আসবেন তখনই সিংহ সাদিক ভাইয়ের বাসায় যাওয়া যাবে; সাদিক ভাই কিন্তু আজকালকার অদ্ভুত সার্টিফিকেট যোগাড় করা মুক্তিযোদ্ধা না, এই অঞ্চলের সত্যিকার একজন কিংবদন্তী মুক্তিযোদ্ধা; তবে তার অস্ত্রের ঝনঝনানি আর তার পরিবারের কিছু বাড়াবারি রকমের অত্যাচারের কারণে ওনার সেই সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়েছে।  
ক্যামেরাম্যান বললেন,  
-কি এমন বাড়াবাড়ি যে সুনাম ক্ষুণ্ণ হল তার নিজের এলাকায়।

নানকা ভাই বললেন,  
-তার বাবার দু'য়েকটা গল্প শুনলেই বুঝবেন কি রকম বাড়াবাড়ি; একবার তার বাবা শহরের মাঝে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন; একদিন বাজারের মাঝখানের চত্বরে পুলিশ তার গাড়ি থামিয়ে গাড়ির কাগজপত্র দেখাতে বললেন, সাদিক ভাইয়ের বাবা গাড়ি থেকে নেমে একেবারে উলঙ্গ হয়ে বললেন, এই শরীর থেকে উৎপাদন হয়েছে তোদের সিংহ সাদিক; আরেকবারের ঘটনা, বড় বড় সব জেলা, বিভাগীয় সরকারি কর্মকর্তাদের জানালেন, তার ঘরে নতুন অতিথির আগমন হয়েছে, তার জন্ম উপলক্ষে সকলের দাওয়াত; হাজার হলেও সিংহ সাদিক ভাইয়ের বাবার দাওয়াত, সব অফিসার বিভিন্ন উপঢোকন নিয়ে হাজির; সকলেই খুব উৎসুক নাতি দেখার জন্য; তারা ধরেই নিয়েছেন যে, ওনার নাতি হয়েছে কিন্তু নাতি তো আর আসে না; অনেষ্ণ পরে সবাইকে নিয়ে একটি ঘোড়া দেখিয়ে বললেন, এর বাচ্চা হয়েছে; আরেকটি ঘটনা বলি, সাদিক ভাইয়ের বাবার মৃত্যুর পর ঘটনাটি ঘটলো; তার জানাজায় বহু মানুষের সমাগম, সকলে সাদিক ভাইয়ের বাবার মুখ দেখার জন্য ধাক্কা ধাক্কা, সকলের উদ্দেশ্য একটাই, সত্যিই মারা গিয়েছেন কিনা সেটা নিশ্চিত হওয়া, কারণ, উনি এর আগেও জন্ম-মৃত্যু নিয়ে মানুষকে বহুবার বোকা বানিয়েছিলেন।

সঞ্চালক বললেন,  
-সব মানুষ এক রকম হয় না; তাছাড়া একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, আমাদের মানুষের ব্রেইনের জটিল বিশ্লেষণ প্রক্রিয়াজনিত কারণে প্রতি ছয় হাজার মানুষের মাঝে একজন মানুষের ব্রেইনের বিশ্লেষণজনিত জগতের উপলব্ধি অন্য মানুষ থেকে আলাদা; আমরা যে ভাবে বিশ্ব জগতকে প্রত্যক্ষ করি তারা সেভাবে করে না।  
আমি বললাম,  
-তারমানে কি এই দাঁড়ালো যে, আমাদের মাঝে প্রতি ছয় হাজারে একজন পাগল আছেন।

সঞ্চালক বললেন,  
-বিষয়টিকে এভাবে দেখলে হবে না; যেমন ধরেন, আপনি কোন ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলার সময় যদি আপনার ক্যামেরা কে এদিক সেদিক নাড়তে থাকেন, তখন ক্যামেরার সামনের স্থির বস্তু গুলো ক্যামেরার সাথে সাথে

হলে পরে; একই কারণে আপনি যখন আপনার নিজের মাথাকে এদিক সেদিক নাড়াবেন বা দোলাবেন, তখনও তো হিসেব অনুযায়ী আপনার সামনের স্থির বস্তু গুলোরও নড়বার কথা কিন্তু আপনার ব্রেইন ঐ বস্তুগুলোর স্থান নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়েছে বলে আপনি ওগুলোকে স্থির দেখছেন।

আমি বললাম,

-নাহ, আপনার ব্যাখ্যা মানতে পারলাম না; আপনি স্থান সূচক কে মানসিক সূচকের সাথে এক করে ফেলছেন; মানসিক সূচকের বিশ্লেষণ অন্য রকম হওয়া উচিত।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-মানসিক সূচকের হিসেব নিতে চাইলে আপনাকে রবিন্দ্রনাথের কাছে যেতে হবে; তিনি “ছুটি” গল্পে তেরো-চৌদ্দ বছরের একটি ছেলের মানসিক অবস্থান নিয়ে খুব সুন্দর কিছু কথা বলেছেন, “তেরো-চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মতো পৃথিবীতে এমন বাল্যই আর নাই। শোভাও নাই, কোনো কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গ সুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধো-আধো কথা ও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি এবং কথামাত্রই প্রগলভতা।..... শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোনো স্বাভাবিক অনিবার্য ক্রটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।” কিন্তু রবি বাবু যেটা তিনি বলেননি সেটা হচ্ছে, এই তেরো-চৌদ্দ বছর পর্যন্ত বয়স পাড়ি দেবার সময়টুকুতে সেই বালকের অভিজ্ঞতা।

আমি বললাম,

-এই একটা ভাল কথা বলেছেন; আমার অদ্বুত কিছু অভিজ্ঞতা আছে; আমি আমার দেড় বছর দুই বছর বা তিন বছরের কিছু অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করতে পারি; ছোট বেলায় মাকে যখন আমার সেইসব অভিজ্ঞতার কথা বলতাম, তখন উনি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলতেন, অসম্ভব, তুমি অন্যের কাছে গল্প শুনে শুনে মনে করছো ওগুলো তোমার মনে আছে; আমি বলতাম, এই ঘটনার কোন কথাটা তুমি বা অন্য কেউ আমাকে বা আমার সামনে আলাপ করেছো বল; মায়ের কোন উত্তর ছিল না।

সঞ্চালক বললেন,

-আপনি তো চলে গেলেন স্মরণ শক্তির কারণের কাছে কিন্তু ক্যামেরাম্যান আলাপ করছেন, মানসিক গঠন প্রক্রিয়ার চৌদ্দ বছর পর্যন্ত একটি মানুষের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সমন্বয়ের কথা; আমার মতে, প্রত্যেকটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন না থাকে তার কোন অভিজ্ঞতা, না থাকে কোন ডেপথ পারসেপশন, সময়ের সমন্বিত জ্ঞান, না থাকে একটা বল ধরার অভিজ্ঞতা, না থাকে বলটি ছুড়ে ফেলে দিলে কি হতে পারে সে সম্পর্কে কোন ধারণা; সে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিষয় গুলোকে ব্রেইনকে শেখায়; যদি কোন কারণে ব্রেইনকে সেই শিক্ষা দেবার সময় তার অভিজ্ঞতা ভিন্ন হয় তখন তার ব্রেইনও আর দশজন থেকে ভিন্ন ভাবে শিখবে; সে কারণেই সমীক্ষাটিতে বলা হয়েছে, প্রতি ছয় হাজারে একজন মানুষের অভিজ্ঞতা অন্য রকম হয়ে থাকে এবং তার মানসিক সূচকও ভিন্ন হতে বাধ্য।

আমি এতবড় তত্ত্বের মাঝে হাবুডুবু খেতে খেতে বললাম,

-ভাই, ছিলাম আমরা সিংহ সাদিক ভাইয়ের বাবার অদ্বুৎ কাল্ডকারখানার ব্যাখ্যায়, সেখানে এসব কথা কি কাজে আসলো।

সঞ্চালক বললেন,

-আসলো না মানে; আপনি কি জানেন, একটি শিশু আঠারো মাস বয়স পর্যন্ত যা চোখের সামনে দেখে সেটাকেই মনে করে একমাত্র বাস্তব; চোখের সামনে নাই তো সেটা নাই।

আমি বললাম,

-তারমানে অনেকটা কাক যেমন চোখ বন্ধ করে মনে করে কেউ তাকে দেখছে না সেই রকম।

সঞ্চালক বললেন,

-ঠিক উদাহরণ দিয়েছেন; যে কারণে দেখবেন, সাধারণত আঠারো মাস বয়স পর্যন্ত বাচ্চাদের চোখের আড়ালে যেয়ে আবার যদি হঠাৎ তাদের চোখের সামনে আসেন, তাহলে তারা মনে করে, এটা একটা ভোজবার্জি বা ম্যাজিক।

মুক্তি বললো,

-তাহলে তো শিশুদের বিজ্ঞানের জনক বলা উচিত; শিশুরা কোয়ান্টাম মেকানিকের মূল থিয়োরিকে ফলো করছে।

মুক্তির কথাগুলোকে আমার অতি পাকামি মনে হল, বললাম,

-আমাদের ভাবনা ক্লাবের এই এক সমস্যা, কই থেকে আলাপ শুরু হয় আর কোথায় যেয়ে শেষ হয় মাথামুন্ডু আমি এখনো বুঝি না; যে কারণে এখনো নোটই লেখি শুধু, পুরো বই লেখা আর হয়ে ওঠে না।

ক্যামেরাম্যান বহুক্ষণ পর মুখ খুললেন,

-না ভাই, অন্তত এই বিষয়ে আমি মনে করি আমরা লাইনচ্যুত হই নাই; আমরা সাদিক ভাইয়ের বাবার পাগলাটে আচরনের কারণ নিয়েই আলাপ করছি।

আমি বললাম,

=কিভাবে সেই যায়গাতে আছি বলুন তো।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-আমি ওনাকে দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে পারবোনা, কারণ, আমি ওনার সম্পর্কে কিছুই জানি না; তবে আমাকে দিয়ে কিছুটা ব্যাখ্যা করতে পারি; আমি নিজেকে কিছুটা বাঁধন ছাড়া, বিদ্রোহী মনোভাবের মানুষ মনে করি, কারণ, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল দশ বছরের কাছাকাছি, অর্থাৎ, রবি বাবুর “ফটিক” এর চেয়ে বছর চারেক কম; “ফটিক” চরিত্রটিকে যদি রবিন্দ্রনাথ আর চার পাঁচ বছর আগে থেকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করতেন, তাহলে দেখতেন ফটিকের জিজ্ঞাসা মন কেন নির্ভিক ভাবে বেড়ে উঠেছে; কোন কারণে সে গ্রাম থেকে এসেও কলকাতার মত বিরাট শহর থেকে মায়ের কাছে যাবার জন্য শরীরে ভীষন স্বর নিয়েও একা বেড়িয়ে পরে।

আমি বললাম,

-আপনি বিদ্রোহী বা বাঁধন ছাড়া এই কথাটা ঠিক মেনে নিতে পারলাম না; আপনাকে দেখতে তো একেবারে শান্ত সুবোধ মানুষই মনে হয়।

সঞ্চালক হেসে দিয়ে বললেন,

-আমিও আপনার সাথে একমত; শুনি আপনার মুক্তিযুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা, তারপর আমরা বিশ্লেষণ করবো আসলেই আপনি সেই অভিজ্ঞতার কারণেই এমন সুবোধ হিসেবে নিজেকে আমাদের সামনে লুকিয়ে রাখার খোড়াক পেয়েছেন নাকি সত্যিই আপনি জীবন যুদ্ধের একজন “বিদ্রোহী রণক্লাস্ত” সৈনিক।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-আসলেই মুক্তিযুদ্ধের বিশাল জগতে যেতে ইচ্ছা করছে না; তাছাড়া একটা বাচ্চা ছেলের পরিপূর্ণ মানসিক গঠনে ছোট্ট দু'য়েকটা মুক্তিযুদ্ধের গল্প দিয়ে সম্পূর্ণ বিষয় বোঝানো যায় না।

সঞ্চালক বললেন, আমাদেরই বা তাড়া কোথায়।

শুরু হল ক্যামেরাম্যানের মুক্তিযুদ্ধের গল্প,

-নাই, এত বড় প্রসঙ্গ এখন নয়। শুধু এটুকু বলি, মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার যে বয়স ছিল, সে বয়সের চেয়েও কম বয়সের মানুষ আজকাল নিজেকে যখন মুক্তিযোদ্ধা দাবী করে তখন হাসিই পায়; তারপরেও তাদের দাবীর পক্ষে আমি, কারণ, আমার মত একটি বাচ্চা ছেলে যখন মুক্তিযোদ্ধার কাছ থেকে টমিগান নিয়ে গুলি চালায় অথবা যখন অর্ধমৃত একটি মানুষ বাড়ির দোরগোড়ায় পানি পানি করে কাংরাচ্ছে দেখেও কেউ একফোটা পানি নিয়ে এগিয়ে যাবার সাহস পায় না, কিংবা যখন নদীর এপার থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে থাকে অপর পারের গ্রামে পাক আর্মি ও তার দোসরদের তালুব, এরপর সেই তালুব থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টায় সারারাত হাঁটতে থাকা

সেই ছেলেটি ও তার পরিবারের ঘুমাতে বা প্রাকৃতিক ডাকে সারা দিতে পাট ক্ষেতকে বেছে নিতে হয়, তখন সেই ছেলেটির মন ভয় শূন্য হয়ে যায় বৈকি, তখন সেও হয়ে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের অংশ, একজন মুক্তিযোদ্ধা।

সঞ্চালক বললেন,

-আমার কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি আপনার বয়সের কাছাকাছি সময়েই, খুব উত্তেজনায় ভরপুর সময় কাটিয়েছি একটা; বাবা চলে গিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে; আমাদের পুরো পরিবারে আমিই বড় সন্তান, বাকি তিন ভাই বোন কোলের বললে ভুল হবেনা; মায়ের দুশ্চিন্তা শুধু বাবার জন্য নয়, আমাদের এবং তার নিজেকে নিয়েও; সুতরাং, মায়ের সময় নেই আমার দিকে নজর দেবার; পড়া লেখার বালাই নেই, স্কুলে যাবার প্রয়োজন নেই, মায়ের সাথে চলে এসেছি গ্রামের বাড়ি; এর মাঝে চলে এসেছিল পাশের শহর থেকে আমার তিন মাসের ছোট মামাতো ভাই; মামা তাকে আমাদের সাথে গ্রামের বাড়িতে রেখে চলে গিয়েছেন; আমাদের দু'জনকে আর পায় কে; বাঁধন ছাড়া দুই বাচ্চা ছেলে, পুরো গ্রামকে তটস্থ করে রাখতাম; পুরো গ্রামই আমাদের আল্লীয় স্বজন, শহরে দুই বাচ্চা আল্লীয়কে না পারে কিছু বলতে, না পারে সহ্য করতে; আজ এই বাড়ির কলা গাছ কেটে ভেলা বানিয়ে নদীতে ভেসে বেড়ানো তো কাল ঐ বাড়ির আম গাছ থেকে আম পেড়ে খাওয়া; চাইলেই যদিও নৌকা পাওয়া যায়, চাইলেই তারা আম পেড়ে খাওয়াবে আমাদের কিন্তু এই দূরন্তপনায় আমাদের আনন্দ ছিল বেশী; একবার তো মাকে বলে তিন চার মেইল দূরে খালার বাড়িতে যেয়ে থাকবো বলে বের হয়ে পরলাম দুই ভাই; খালার বাড়িতে নিজেদের চেহারা দেখিয়ে বিনা টিকেটে ট্রেনে ট্রেনে কোথা থেকে যে কোথায় গিয়েছি, আজ এই ক্ষণে বসে সেটা মনেও করলেও দুঃসাহসিক ভাবনা বলে মনে হয়; মুক্তিযুদ্ধের সময়টুকু আসলেই আমার জন্য স্বাধীনতার বছর।

আমি বললাম,

-দেখেন দেখেন, আগেই বলেছিলাম আমাদের ক্লাবের ভাবনার কোন লাগাম নেই, এখন দেখেন, কোথায় রয়েছে সাদিক ভাইয়ের বাবা আর কোথায় রয়েছে আমাদের ভাবনা।

সঞ্চালক বললেন,

-কেন, সূত্র তো দু'টোরই এক; দু'টোই মুক্তিযুদ্ধের গল্প এবং সাথে রয়েছে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ঘটনায় মানুষের মানসিকতা গঠনে প্রভাব।

ক্যামেরাম্যান বললেন,

-থাক এসব প্রসঙ্গ; সাধু বাবার অদ্ভুত ঘটনার কল্যাণে গতকাল সারারাত ঘুমাতে পারিনি; সাওতালদের বিয়ের উৎসব দেখার আমার খুব শখ; চলুন, তাড়াতাড়ি মেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে একটা ঘুম দেই।

নানকা ভাই বললেন,

-একটু ফ্রেশ হয়ে নিন।

সঞ্চালক বললেন,

-ফ্রেশ হবার কিছু নেই, চলুন রওনা হওয়া যাক।

রওনা হলাম সবাই, সাওতালি বিয়ের উৎসব দেখবো বলে।

## **বিয়ে বাড়ির গল্প**

নানকা ভাই আথারে-পাথারে দুর্ধর্ষ গাড়ি চালিয়ে আমাদের নিয়ে যখন বিয়ে বাড়িতে চা শ্রমিকদের গ্রামে পৌঁছালেন, তখন খুব একটা রাত নয়। প্রথমে তো কিছুটা হতভম্বই হয়ে পড়লাম, কিসের উৎসব আর কিসের বিয়ে, লোকজন খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। নানকা ভাই জোড়ে একটা হাঁক দেবার সাথে সাথে খুব বেশী হলে ৮ ফুট বাই ১০ ফুট সাইজের ঘর গুলো থেকে পঙ্গপালের মত বেড়িয়ে এলো শুধু মানুষ আর মানুষ। ঐ ছোট ঘর গুলোতে তিন প্রজন্মের আবা-বৃদ্ধ-বনিতা কিভাবে একসঙ্গে বসবাস করে সেটা থিয়োরী অব প্রবাবিলিটি, টেলিপোর্টেশন, টাইম ডাইলেশন থিয়োরি সহ কোন থিয়োরীতেই স্থান দিতে পারলাম না।

আমাদের আতিথেয়তা কি ভাবে করবে সেটা নিয়ে তাদের উৎকর্ষা, দুশ্চিন্তা থামাতে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত হতে পারছিলাম না। চারিদিকে হুলস্থূল কান্ড, কেউ পানি নিয়ে আসছে, কেউ চেয়ার, টেবিল আনছে, চারিদিক থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছে। সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হল, রাত্রির এই প্রথম প্রহরেই সকল পুরুষ মনে হল নেশা ক'রে বসে আছে। এই বদ অভ্যাসের কথাই বোধহয় নীরু বলেছিল। বিয়ের অনুষ্ঠান পর্যন্ত আমরা থাকতে পারবো না শুনে তো মনে হল তাদের মাঝে দুঃখের মাতন শুরু হয়ে গিয়েছে। নানকা ভাই অনেক বৃষ্টিয়ে তাদের শান্ত করলেন।

ঘটনা ঘটলো কনে দেখতে যেয়ে। আমরা সবাই অবাক হ'য়ে তাঁকিয়ে আছি কনের দিকে, তারচেয়েও অবাক হয়ে তাঁকিয়ে আছি কনের বান্ধবীর দিকে। চা বাগানের শ্রমিকের মেয়ে হিসেবে কনে অবশ্যই বেমানান। সাথের বান্ধবী তো মোটেই সাওতাল বলে মনেই হয় না। দু'জনেরই বয়স বিশের কোঠা ছাড়িয়ে খুব একটা বেশী দূর গিয়েছে কি যায়নি সেটা বলা দুষ্কর। অনিন্দ সুন্দরী তো বটেই, এই চা শ্রমিকদের মাঝে আধুনিক শহরে মেয়ের উপস্থিতি আমরা আশা করিনি বলেই হয়তো বিস্ময়াভিভূত হয়েছি বেশী। জড়তার লেশমাত্র নেই দু'জনেরই। মূর্তের মাঝে যেন আপন করে নিল তাদের বয়সের চেয়ে ২/৩ গুন বেশী বয়সী মানুষগুলোকে।

বিভিন্ন গল্পে জানলাম, কনের নাম শান্তা, কনের বান্ধবীর নাম জুঁই। দু'জনেই মৌলভীবাজারে একসাথে কলেজে পড়া লেখা করেছে। জুঁই এখন আইন বিষয়ক পড়া লেখা করছে। শান্তা আর পড়েনি, কারন, এর মাঝেই তার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল, শান্তার হবু জামাই ম্যাট্রিক পাশ করে এই বাগানেরই বাবুর কাজ করে। বাগান শ্রমিকদের সন্তানাদিরা ম্যাট্রিক পাশ করলেই সাধারণত ঐ বাগানেই চাকরী নেয় এবং তাদের সকলেই শ্রমিকদের কাছে বাবু।

শুরু হল সাওতালি নাচ-গানের পালা। সুর-তাল-লয়ের মূর্ছনায় কিছুক্ষণ বিমোহিত সময় কেটে গেল। জুঁই দেখলাম কনের বাড়ি নিয়ন্ত্রন করছে। সকলকে নির্দেশ দিচ্ছে, সে নিজেই এক সময় ঘরের বাইরে যেয়ে নিয়ে এলো এক অদ্ভুত খাবার। চানাচুর, মুড়ি, কাঁচা মরিচ আর অনেক চা পাতা মেশানো নাস্তা। নানকা ভাই আস্তে আস্তে কানে কানে বললেন,

-এটা বেশী খাবেন না। কাঁচা চা পাতা শরীরের জন্য খারাপ।

আমি বললাম,

-এরা তো মজা করে থাকে।

উনি বললেন,

-ওরা এতে অভ্যস্ত, কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, কাঁচা চা পাতা বেশী খেলে মানুষের ব্রেইন অচল হয়ে যায়।

জুঁই কথাটা শুনে ফেললো। একে তো পিচ্চি একটা বাচ্চা মেয়ে। শাড়ি পরে আর বান্ধবীর বিয়েতে এসে সেও যেন পুরো সংসারী। কোমড়ে শাড়ি গুজে যেন রুখে দাঁড়ালো নানকা ভাইয়ের সামনে, বললো,

-ওনাদের বাঁধা দিচ্ছেন, আমার বান্ধবীদের বাধা দেয়ার কোন উদ্যোগ অন্তত নিয়েছেন কি।

নানকা ভাই কিছুটা অপ্রস্তুত জুঁইয়ের আক্রমণে, বললেন,

-এটা ওদের শত বছরের অভ্যাস, এক ধরনের নেশাও হয়, না করলেও শুনবে না।

জুঁইয়ের যুদ্ধংদেহী মনভাবের সামনে নানকা ভাই যে উড়ে যাবেন সেটা বোঝা যাচ্ছিল। নানকা ভাইয়ের আতিথেয়তায় আছি আমরা, অন্তত এই বিষয়ে মুখ ফুটে কড়া কথা কিছুই বলা তো সম্ভবই নয় বরং জুঁইয়ের আক্রমণ থেকে উদ্ধার করার জন্য আমি শুধু হাঙ্কা করে বললাম,

-নেশা না ফিধের জ্বালা।

নানকা ভাই উত্তর দিলেন,

-শুরুটা ফিধের জ্বালা থেকেই কিন্তু এখন এটা কিছুটা নেশা আর কিছুটা প্রথা। ত্রিশ বছর আগের চা শ্রমিক আর আজকের চা শ্রমিকদের মাঝে অনেক পার্থক্য আছে। ত্রিশ বছর আগের তুলনায় তাদের বেতন এখন দশগুন, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি হয়েছে, হচ্ছে।

একটা বিষয় অনেষ্ণণ যাবৎ লক্ষ করছিলাম। জুঁই আমাদের সাথে কথা যাই বলুক না কেন, দৃষ্টি তার মুক্তির দিকেই চলে যাচ্ছে বারেবারে। ভাতিজা আমার নির্লিপ্ত ভাবের এমন একটা বাঁধ তৈরী করছে নিজের সামনে যে, মেয়েটি তার কথার বন্যা চাইলেও মুক্তির দিকে ঘুড়িয়ে দিতে পারছে না।

বেশ কিছু সময় এরকম ক্ষুণ্ণসূচিতে কেটে গেল, মুক্তি দেখছি আমাকে কিছু একটা বলার জন্য উসখুস করছে, বলতে পারছে না। সুযোগ বুঝে আমার কানে কানে কথাটা বলেই ফেললো। আমি অবাক বিস্ময়ে একবার ভাতিজার দিকে তাকাচ্ছি আর একবার জুঁইয়ের দিকে তাকাচ্ছি। বুঝবার চেষ্টা করছি, দু'জনের এতো নির্লিপ্ততা, পারিপার্শ্বিক এতো হৈচৈ, এতো মানুষের মাঝে ঘটনাটা ঘটলো কখন। বুঝে নিলাম যে, আমরা এযুগের মানুষ নই, আমাদের বয়স হয়েছে।

ভাতিজা বললো,

-কাকা, জুঁই তার মোবাইল নাম্বার আমাকে দিয়েছে, আমার নাম্বারও তাকে দিয়েছি; এখন কয়েকটা ছবি তুলতে চাই আপনাদের সাথে কইল্লার এবং জুঁইয়ের, মোবাইলটা যদি খোলার অনুমতি দিতেন।

বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে ফিসফিস করে ভাতিজাকে বললাম,

-অনুমতি তুমি পাইতে পারো তবে তার আগে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াও, কান চুলকানোর ভঙ্গীতে আস্তে করিয়া দুই কান ধরিয়। আবার চেয়ারে বস।

ভাতিজা আমার এতই বেচায়ন হ'য়ে পরেছে যে, কে দেখলো, কে দেখলো না এসবের ধারই ধারলো না। সটান উঠে দাঁড়িয়ে কান দুটো ধরে আবার বসে পরলো। আমারও আর অনুমতি না দেবার কোন উপায় রইলো না। আমাদের ছবি কয়টা তার ক্যামেরায় উঠলো হিসেব করিনি, তবে জুঁইয়ের সাথে তার ছবি তোলায় হিসেব ঠিকই রাখলাম, বহু ছবি। বুঝলাম ভাতিজার এবং মেয়েটির একে অপরকে ভাল লেগেছে। দু'জনের বিয়ের বিষয়ে ভাতিজার বাবা-মায়ের সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আলাপ করতে হবে।

শ্রমিকদের সাথে বসে খাওয়া দাওয়া সেরে আমাদের সবার শরীরই হঠাৎ করেই ছেড়ে দিল। গত দুই দিনের টানা ভ্রমণের ধকল আর ঘুমহীন রাত মনে হয় শরীর মন দুটোকেই স্তম্ভ করে ফেলেছে। সুতরাং, তাড়াতাড়ি নিজেদের রাত্রি যাপন বাংলাতে ফিরে এসে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চলে গেলাম বিছানার কোলে।

আগামীকাল ভোরে উঠে আমি আর মুক্তি চলে যাবো নির্বাচনী কাজে, বাকি সবাই ঢাকার ফিরতি প্লেনে উঠবেন। মৌলভীবাজারে স্যাটারডে ক্লাবের আড্ডা শেষ হল, অন্তত আমার জন্য।

## ঢাকার পথে

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় খবর নিয়ে জানলাম, ইঞ্জিনিয়ার সৃষ্ট কোন ঝুট ঝামেলা ছাড়াই স্যাটারডে ক্লাবের বাকি তিনজন ঠিকঠাক মত ঢাকায় পৌঁছেছেন। সেদিন বাগান থেকে ভোরে রওনা হয়ে নির্বাচনী কাজ সেরে আজ শুক্রবার রাত বারোটোর বাসে চড়েছি আমি আর মুক্তি। বাসে পাশাপাশি বা কাছাকাছি কোন সিট পাইনি আমরা দু'জন। বাম দিকের একটা করে সিটের সারির প্রথমের চেয়ারে একটা, অন্যটা আরো তিনটা সিট ছেড়ে। সামনের সিটটায় আমি আর আমার তিন সিট পরে মুক্তি বসেছে। আমি আবার বাসে ঘুমাতে পারি না। জেগে জেগে রাস্তা দেখছি। কুয়াশা বেশ ছিল, সাথে ছিল ঝিড়ঝিড়ে বৃষ্টি। দৃষ্টি শক্তির সীমাবদ্ধতা মাথায় রেখে ড্রাইভার যে বাসটি খুব আস্তে চালাচ্ছিল তা নয়। আমি দু'একবার ড্রাইভারকে বললাম একটু আস্তে চালাবার জন্য। ড্রাইভার প্রতিবারই মুচকী হেসে বলেছে, এই রাস্তাকে তার নিজের হাতের তালুর মতই জানা আছে।

কতক্ষণ গিয়েছে, কোথায় এসেছি জানি না। পরে সব মিলিয়ে মনে হয়েছে, রাত প্রায় দুটোর কাছাকাছি সময়ে ঘটনাটি ঘটেছিল। উলটো দিক থেকে আসা একটি গাড়ির হেড লাইট হঠাৎ আমাদের দিকের রাস্তার দিকে ঘেসতে শুরু করলো। মনে হল যেন গাড়িটি ইচ্ছে করেই আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে। ঘটনাটি চোখের পলকে

যদিও ঘটে নাই, প্রায় চার পাঁচ সেকেন্ডের ঘটনা। আমাদের ড্রাইভার শেষ চেষ্টা হিসেবে ডান দিকে তার গাড়ি ঘোরাতে শুরু করলো। মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো না কিন্তু পর মহুতেই মনে হল আকাশ ভেঙ্গে পরেছে। এতো বিকট শব্দ আমি আগে কখনো শুনিনি। বাসটি ধাক্কা খেয়ে যেন উড়ে গেল বেশ কিছুদূর, সাথে কলজে কাঁপানো বিকট শব্দ চলতেই থাকলো। এক সময় সব থেমে গেলো। আমি শুধু সিট থেকে ছিটকে পরে গিয়ে হাতে আর পায়ে কিছু ব্যাথা পেয়েছি। তাড়াতাড়ি উঠে মুক্তির খবর নেয়ার জন্য পেছনে যেয়ে দেখি, মুক্তি যেখানে বসা ছিল সেখানেই ট্রাকটি ধাক্কা মেরে ভেতরে ঢুকে বসে আছে, মুক্তির দেহটি ট্রাকের বনেটের কোনে ঝুলে আছে, মুক্তির সামনের দুটো সিটও এক্সিডেন্টের ধাক্কায় দুমড়ে গিয়েছে।

হ্যা, একটি অতিরিক্ত ওজন বহনকারী ট্রাকই আমাদের বাসটিকে এসে বাম দিক থেকে আঘাত করেছিল। বোধহয় ট্রাকের ড্রাইভার ঘুমিয়ে পরেছিল। আমি তাড়াতাড়ি মুক্তিকে ট্রাকের বনেট থেকে ছুটিয়ে এনে বাসের বাইরে নিয়ে এলাম। মুক্তির চোখ খোলা, মুখে কিছুটা বিরক্তির ছাপ। বাইরে আনতেই আমাকে মুচকি একটা হাসি দিয়ে বলল,

-কাকা, থিওরী অব প্রবাবিলিটি কি এখানে মিলেছে। আপনি তো জীবনে বহুবার বাসে করে ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-চট্টগ্রাম যাওয়া আসা করেছেন, আপনার রেইন আপনাকে কত পারসেন্ট কনফার্ম করেছিলো এক্সিডেন্ট হবার।

আমি বললাম,

-এম্বুলেন্সের জন্য ফোন করেছি, এখন কথা বলো না।

কথাটা বলার পরপরই মুক্তিকে রাস্তার যেদিকে এনে আমার কোলের উপর তার মাথাটা রেখে মাটিতে শুইয়ে রেখেছিলাম, সেটার উলটো দিকে তাকাবার জন্য মুক্তি ঠগার করা করলো। তাকিয়ে শরীরের রক্ত হীম হয়ে গেল। সেই অর্ধ উলঙ্গ, চুল দাড়িতে ঢাকা চা বাগানের সেই সাধু বাবা। তার সেই অঙ্গারের মত লাল স্বলস্বলে চোখ দুটো দিয়ে তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকেই!! কিছুক্ষণ পর সেই সাধু বাবা রাস্তার ওপাশ থেকেই, সেই একই ভঙ্গীতে হাত দুটো সামনে এনে বললেন,

-যাহ, যাহ, রক্ত, রক্ত, বিপদ, বিপদ, ঢাকা গেলি না কেন!!

তারপরই কুয়াশার মাঝে যেন হারিয়ে গেলেন। তারপরই মুক্তির মাথা একদিকে হেলে পরলো, মুক্তি আমার কোলের উপর মাথা রেখে মারা গেল। বহু ভেবেছি, কোন উত্তর পাইনি। একবার তো ভাবলাম নানকা সাহেবের বাগানে যেয়ে সাধু বাবাকেই প্রশ্ন করি, সাহসে কুলায়নি। সাধু বাবাই কি ছিলেন ওটা, থাকলে এতোদূরে এই সময়, এই যায়গায় কি ভাবে এলেন, এটা কোন থিয়োরীতে পরে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স, টেলিপোর্টেশন? টাইম মেশিন? টেলিপ্যাথি? সাইকোলজিকাল ফেনোমেনা? দুর্ঘটনার সময়টা যদিও জানুয়ারীর শেষের দিকে ছিল, তারপরও শীতের দিনের এই বৃষ্টির কারণ কি জলবায়ু পরিবর্তন? মুক্তির বলা গল্পের সেই নিবিড় গ্রহ কি আমাদের পৃথিবীর খুব কাছাকাছি চলে এসেছে? নাকি সব কিছুই টাইম টানেলে আবদ্ধ আমাদের ভবিষ্যৎ? আমার জানা নেই।

(সমাপ্ত)